ইবনে রজব হাম্বলী রহ.
সালাফদের
ইলমী
শ্রেষ্ঠত্ব
অনুবাদ
আবদুল্লাহ আল মাসউদ

সালাফদের ইলমী শ্রেষ্ঠত্ব

সালাফদের ইলমী শ্রেষ্ঠত্ব

ইবনে রজব হাম্বলী রহিমাহুল্লাহ

আবদুল্লাহ আল মাসউদ

অনূদিত

উৎসর্গ

আমার প্রিয় উস্তায ও শায়খ মুহিউস সুন্নাহ আল্লামা মাহমূদুল হাসান সাহেব হাফিজাহুল্লাহ এর সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘ নেক হায়াত কামনায়–যিনি প্রতিনিয়ত আমাদের সামনে তুলে ধরেন সালাফদের মান-মর্যাদা। শেখান, কীভাবে সালাফদের ভালোবাসতে হয় এবং তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করতে হয়।

সূচি

অনুবাদকের কথা

আমরা এমন একটা সময়ে বাস করছি, যখন চারদিকে শুধু ফিতনা আর ফিতনা। ডানেও ফিতনা, বামেও ফিতনা। সামনেও ফিতনা পেছনেও ফিতনা। এ যেন ফিতনার মহা সমুদ্র। সবাই সেখানে সাঁতার কাটছি। সমুদ্রের যেমন কোনো কূলকিনারা নেই, ফিতনারও তেমনই কোনো শেষ নেই।

এসব ফিতনার মধ্যে বর্তমান সময়ে যে বিষয়টা মহামারির আকার ধারণ করেছে এবং সাধারণ শিক্ষায় শিক্ষিতরা তো বটেই, অনেক ক্ষেত্রে আলেম-উলামা ও তালিবুল ইলমদেরও গ্রাস করছে তা হলো, পূর্বযুগের উলামায়ে কেরাম এবং সালাফে সালেহীনদের তুলনায় পরবর্তী যুগের আলেমদের বেশি গুরুত্ব দেওয়া। তাদের বেশি জ্ঞানী ও অধিক ইলমের অধিকারী মনে করা।

এই ফিতনাটা আজকের যুগের নতুন কিছু নয়। পূর্বযুগেও এর অস্তিত্ব ছিল। যদিও সেটা এখনকার মতো এতটা শক্তিশালী ও প্রবল ছিল না। তারপরেও উলামায়ে কেরাম এই বিষয়ে কলম ধরেছেন। এই ফিতনা ডালপালা বিস্তার করার আগে অঙ্কুরেই তাকে বিনাশ করে দেবার চেষ্টা করেছেন। নিজেদের রচনায় বারংবার এই বিষয়ে সতর্ক করেছেন।

সালাফে সালেহীন হলো মূলত আমাদের স্তম্ভ। এই স্তম্ভকে কোনোভাবেই দুর্বল হতে দেওয়া যাবে না। এই স্তম্ভকে দুর্বল হতে দেওয়ার মানেই হচ্ছে দ্বীনের দালানকে নড়বড়ে করে দেওয়া। তাছাড়া সালাফদের অনুসরণ হচ্ছে সবচেয়ে নিরাপদ ও সতর্ক পথ। কারণ, তারা আমাদের চেয়ে হাজার গুণ বেশি মুত্তাকী, পরহেজগার ও দ্বীনের গভীর ইলমের অধিকারী ছিলেন। আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ ﷺ বলেছেন, 'তোমাদের মধ্য হতে কেউ যদি কারও অনুসরণ করতে চায় তবে তার জন্য কর্তব্য হলো যারা গত হয়ে গিয়েছেন তাদের অনুসরণ করা। কারণ, জীবিতরা ফিতনা থেকে নিরাপদ নয়।'

ইবনে রজব হাম্বলী ؒ রচিত ফাদলু ইলমিস সালাফ আলা ইলমিল খালাফ এই বিষয়ে লিখিত একটি স্বতন্ত্র ছোট্ট পুস্তিকা। যার মধ্যে তিনি অত্যন্ত চমৎকারভাবে দলিল-প্রমাণের আলোকে সালাফদের শ্রেষ্ঠত্ব ফুটিয়ে তুলেছেন। বর্তমান সময়ের আলেমদের যারা সালাফদের চেয়েও বেশি জ্ঞানী

ভাবছেন এবং দ্বীনী বিষয়ে তাদের বিভিন্ন ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণকে সালাফদের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের ওপর প্রাধান্য দিতে চাচ্ছেন তাদের সমুচিত জবাব দিয়েছেন।

বক্ষ্যমাণ বইটি হলো তাঁর এই ছোট্ট পুস্তিকার বঙ্গানুবাদ। বাংলাভাষী পাঠকদের জন্য আমরা তা অনুবাদ করে প্রকাশ করার উদ্যোগ গ্রহণ করেছি। কারণ, আমাদের দেশেও ব্যাপক হারে এই ফিতনার বিস্তার ঘটছে। এই ফিতনাকে রোধ করার ক্ষেত্রে বইটি সামান্য হলেও ভূমিকা রাখবে বলে আমাদের বিশ্বাস। কারণ, মূল বইয়ের পরতে পরতে রয়েছে লেখকের হৃদয়ের উত্তাপ ও রূহানী ঝলক। বইটি পাঠ করার সময় যা আমি নিজেই অনুভব করেছি। এবং বলা যায় এই অনুভবই আমাকে বইটি অনুবাদে উৎসাহ জুগিয়েছে। যদিও মূল বই আর অনূদিত বইয়ের মধ্যে রয়েছে ভিন্ন ভিন্ন দুই ভাষার ব্যবধান, তবুও অল্প পরিমাণে হলেও মূল বইয়ের আবেদন অনূদিত বইতেও পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। বইটি পড়ে যদি একজন পাঠকও উপকৃত হন তাহলেও আমরা আমাদের কষ্টকে সার্থক মনে করব।

বইটির আলোচনাকে সহজবোধ্য ও গোছানো আকারে উপস্থাপনের খাতিরে আমরা নিজেদের পক্ষ থেকে প্রতিটি নতুন আলোচনা শুরু হবার প্রাক্কালে বিষয়ের সাথে সংগতিপূর্ণ শিরোনাম যুক্ত করে দিয়েছি। আশা করি এটি পাঠককে আলোচনাগুলো সহজে মনে রাখার ক্ষেত্রে যথেষ্ট সহায়তা করবে। সেই সাথে বইটির সৌন্দর্যকেও আরও বৃদ্ধি করবে। কোথাও কোথাও প্রয়োজন অনুভূত হওয়ায় আমরা লম্বা-চওড়া টীকা সংযুক্ত করেছি। এটিও পাঠকদের সংশ্লিষ্ট বিষয়টি আরও ভালোভাবে বুঝতে সাহায্য করবে। কিংবা কোথাও ভুল বোঝার আশঙ্কা থাকলে তা থেকে রক্ষা করবে।

বইটিকে সর্বাঙ্গসুন্দর করার ক্ষেত্রে আমাদের চেষ্টার কোনো কমতি ছিল না। তারপরও যদি কোথাও কোনো ভুল কারও চোখে ধরা পড়ে বা বইটি নিয়ে কারও কোনো ভালো পরামর্শ থাকে তবে অবশ্যই আমাদের জানাতে পারেন। আমরা সানন্দচিত্তে তা বিবেচনা করব এবং পরবর্তী সংস্করণে তা সংশোধন করে নেব। আল্লাহ তাআলা আমাদের ক্ষমা করুন এবং এই খিদমতকে কবুল করুন। আমীন।

আবদুল্লাহ আল মাসউদ

১৬-১০-১৭

দ্বিতীয় মুদ্রণের কথা

'সালাফদের ইলমী শ্রেষ্ঠত্ব' বইটি প্রকাশিত হয়েছিল আজ থেকে প্রায় দুই বছর আগে।প্রকাশের পর এটি পাঠকমহলে বেশ সাড়া ফেলেছিল এবং সবার কাছেই সমাদৃত হয়েছিল আলহামদুলিল্লাহ।যার ফলে অল্প সময়ের মধ্যেই এর দুইটি মুদ্রণ শেষ হয়ে গিয়েছিল।এরপর দীর্ঘদিন বইটির আর পুনর্মুদ্রণ হয়নি। আল্লাহর মেহেরবানীতে এখন আবার নতুনসাজে একে প্রকাশ করা হচ্ছে।আল্লাহ বইটিকে কবুল করে নিন এবং এটি পুনর্মুদ্রণ হওয়ার পেছনে যাদের শ্রম আছে তাদের সবাইকে জাযায়ে খাইর দান করুন।আমীন।

আবদুল্লাহ আল মাসউদ

রবিউল আওয়াল ১৪৪০ হি.

নভেম্বর ২০১৯ খৃ.

সালাফ কারা? কেন তাদের অনুসরণ করবেন?

সালাফে সালেহীন আমাদের চেতনার বাতিঘর। অন্ধকার পথে আলোর মশাল।তাদের পদাঙ্ক অনুসরণের মাঝে আছে নবিজির রেখে যাওয়া সীরাতে মুস্তাকীমের ওপর অবিচল থাকার নিশ্চয়তা। সালাফদের কথামালা, তাদের জীবনী ও আদর্শের কথা বর্তমান সময়ে বেশ জোরেসোরে আলোচিত হচ্ছে। তাদের বই-পুস্তকও আগের তুলনায় অধিকহারে অনূদিত হচ্ছে বাংলাভাষায়। সালাফদের মর্যাদা আর শ্রেষ্ঠত্ব নিয়েই বক্ষ্যমান পুস্তিকাটি।নতুন সংস্করণে তাই মনে হলো তাদের পরিচয় ও তাদের রেখে যাওয়া পথের অনুসরণের গুরুত্ব এবং প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে কিছু কথা তুলে ধরা দরকার।যাতে সালাফ বলতে কাদেরকে বোঝানো হচ্ছে এবং তাদের অনুসরণের কথা কেন বারবার বলা হচ্ছে সেই বিষয়ে পাঠক কিছুটা ধারণা লাভ করতে পারেন।

সালাফ শব্দের পরিচিতি

সালাফ শব্দটি আরবী। যার শাব্দিক অর্থ হলো পূর্বপুরুষ, পূর্বসুরি। বিখ্যাত অভিধান প্রণেতা আল্লামা ইবনু মানযুর বলেন,

> তোমার আগে আগমনকারী, বয়স ও মর্যাদায় তোমার চেয়ে উচ্চাসনে আছেন যেসব আত্মীয়-স্বজন ও পূর্বপুরুষ, তারাই হল সালাফ। (লিসানুল আরব: ৯/১৫৯)

ইসলামী পরিভাষায় সালাফ বলতে সাধারণত বুঝানো হয় প্রথম তিন যুগের ব্যক্তিবর্গকে। অর্থাৎ, সাহাবী, তাবেয়ী ও তাবেতাবেয়ীদেরকে। তাঁরাই হলেন মূল সালাফ। এই বিষয়ে আমরা কয়েকজনের বক্তব্য দেখে নিতে পারি।

ইমাম বায়জূরী ﵀ বলেন,

> সালাফ দ্বারা উদ্দেশ্য অগ্রজ নবীগণ, সাহাবীগণ, তাবেয়ীগণ ও তাবা-তাবেয়ীগণ।(শারহু জাওহারাতুত তাওহীদ : ১১১)

ইমাম গাযালী ﵀ বলেন, 'সালাফ'-এর পরিচয় এভাবে দেন,

> অর্থাৎ সাহাবী ও তাবেয়ীগণ। (ইলযামুল আওয়াম আন ইলমিল কালাম : ৬২)

আল্লামা সালেহ উসাইমিন ﵀ বলেন–

> সালাফ অর্থ অগ্রজ।যে যার অগ্রজ সে তার সালাফ।তবে সালাফ শব্দ প্রয়োগ করা হলে তার দ্বারা উদ্দেশ্য হল, উত্তম তিন যুগ তথা সাহাবী, তাবেয়ী ও তাবেতাবেয়ীগণ।(ফাতওয়া নূর আলাদ দারব : ১৭৫)

উপরোক্ত আলোচনা থেকে বুঝা গেল, পারিভাষিক অর্থে 'সালাফ' বলতে বুঝায় সাহাবী, তাবেয়ী ও তাবেতাবেয়ীগণকে। এই বিষয়ে রাসূল ﷺ-এর একটি হাদিসকে দলিল হিসেবে পেশ করা হয়।যেখানে তিনি বলেছেন,

خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ

> সবচে উত্তম মানুষেরা হলো আমার যুগের মানুষ।অতপর যারা তাদের পরে আগমন করবে।অতপর যারা তাদেরও পরে আসবে।(সহীহ বুখারী : ২৬৫২)

ইমাম নববী ﵀ এই হাদীসের ব্যাখ্যায় বলেছেন,

> এই হাদীসে আমার যুগ দ্বারা উদ্দেশ্য সাহাবীদের যুগ, তারপরের যুগ হলো তাবেয়ীদের যুগ, তারপরের যুগ হলো তাবেতাবেয়ীদের যুগ। (শরহু মুসলিম : ১৬/৮৫)

তবে পরবর্তীতে যেসব উলামায়ে কেরাম প্রথম তিন যুগের পুণ্যবান এই জামাআতের দেখানো পথে চলেছেন, তাদের আদর্শকে ধারণ করেছেন, লালন করেছেন, তাদেরকেও সালাফদের অন্তর্ভুক্ত মনে করা হয়।তারা দ্বিতীয় পর্যায়ের সালাফ।সময়ের বিচারে যিনি প্রথম তিন যুগের যত কাছাকাছি, তার সালাফ হওয়াটা ততবেশি স্বীকৃত ও জোরাল।

এই বিষয়ে আল্লামা সাফারিইনী ﵀ এর একটি বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন,

> সালাফের নীতি-আদর্শ দ্বারা বোঝানো হয়, সাহাবা, পূন্যবান তাবেয়ীগণ, তাবেতাবেয়ীগণ ও ইমাম হিসেবে স্বীকৃত উম্মাহের

সেসব ব্যক্তিবর্গের মতাদর্শকে, দ্বীনের মধ্যে যাদের মর্যাদা প্রসিদ্ধ এবং প্রজন্ম পরম্পরায় মানুষেরা যাদের কথাকে গ্রহণ করে নিয়েছ; যাদের মধ্যে বিদআত ছিল না অথবা তারা খারেজী, রাফেযী, কাদরিয়া, মুরজিয়া, জাবরিয়া, জাহমিয়া, মুতাযিলা, কাররামিয়া প্রভৃতি মন্দ উপাধীতেও ভূষিত ছিলেন না।(লাওয়ামিউল আনওয়ার : ১/২০)

সালাফদের অনুসরণের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা

যুগে যুগে ইসলামের মধ্যে অনেক ভ্রান্ত চিন্তা ভাবনা ও বিচ্যুত মত-পথের আবির্ভাব হয়েছে। হযরত উসমান ﵁-এর শাহাদাতের সময় থেকে নিয়ে আজ পর্যন্ত সেই ধারা অব্যাহত ভাবে চালু রয়েছে।এসব ভ্রান্তি থেকে নিজেদেরকে মুক্ত রাখার একমাত্র মাধ্যম হচ্ছে সালাফদের দেখানো পথের অনুসরণ করা। তারা যেমন দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করতেন তার অনুকরণ করা।অন্যথায় সীরাতে মুস্তাকিম থেকে ছিটকে পড়া অস্বাভাবিক কিছু নয়।

পবিত্র কুরআনুল কারীম যথাযথভাবে অনুধাবনের জন্য যেমন রাসূল ﷺ-এর হাদীসকে সামনে রাখতে হয়, তেমনি হাদীসকে বুঝার জন্য সাহাবায়ে কেরামের বুঝ ও অনুধাবনকে সাথে রাখতে হয়। অন্যথায় হাদীস বোঝায় বিভ্রান্তি তৈরি হয়। অনুধাবন যথার্থ হয় না; বরং অনেক ক্ষেত্রে গুমরাহ হওয়ারও আশঙ্কা থাকে।

বিষয়টিকে সহজে বোঝার জন্য একটি উদাহরণ দিচ্ছি।আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনুল কারীমে ইরশাদ করেন,

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ

হে নবী, আপনি কাফের ও মুনাফিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ করুন এবং তাদের সাথে কঠোরতা অবলম্বন করুন।(সূরা তাওবা : ৭৩)

এই আয়াতে সুস্পষ্টভাবে কাফির ও মুনাফিক এই দুই শ্রেণীর বিরুদ্ধে জিহাদ করার কথা বলা হয়েছে।কিন্তু রাসূল ﷺ-এর পুরো জীবনী ও সাহাবায়ে কেরামের কর্মপদ্ধতি তন্ন তন্ন করে খুঁজেও আমরা মুনাফিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ করার কোন দৃষ্টান্ত খুঁজে পাই না। রাসূল ﷺ-এর জীবদ্দশায় তিনি সুস্পষ্টভাবে জানতেন কারা কারা মুনাফিক।আল্লাহ তাআলা এই বিষয়ে তাকে

সবিস্তার অবগতি দান করেছিলেন।তবুও তিনি কখনও তাদের বিরুদ্ধে জিহাদে অবতীর্ণ হননি। যদিও প্রথম শ্রেণি তথা কাফিরদের বিরুদ্ধে অসংখ্যবার জিহাদের ময়দানে মুখোমুখি হয়েছেন এবং তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছেন। রাসূল ﷺ-এর সাহাবীরাও জানতেন, মুসলিম বেশধরা লোকদের মধ্যে কারা মুনাফিকির খাতায় নাম লিখিয়েছে।হাদীস থেকে জানা যায়, নবী আলাইহিস সালাম খোদ এই বিষয়ে তাদের অনেককে বিস্তারিত বলে গিয়েছেন।কিন্তু রাসূল ﷺ-এর তিরোধানের পর সাহাবী-যুগের পুরো সময়কালে স্বতন্ত্রভাবে মুনাফিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ করার কোনো দৃষ্টান্ত নেই।

সুতরাং আমাদেরকেও এ আয়াত রাসূল ﷺ ও সাহাবীদের বুঝের অনুগামী হয়ে বুঝতে হবে।তাহলেই আমরা সত্য ও সঠিক পথের অনুসারী বলে বিবেচিত হব।পক্ষান্তরে কেউ যদি এই আয়াতকে নিজের মতো করে বুঝতে যায়, তবে তার পদস্খলন হওয়া অবশ্যম্ভাবী।কারণ সে কাফেরদের মত তার দৃষ্টিতে যারা মুনাফিক, তাদের বিরুদ্ধেও সরাসরি অস্ত্র হাতে যুদ্ধের ঘোষণা দিয়ে বসবে। এর মাধ্যমে তার বিভ্রান্ত ও পথভ্রষ্ট হওয়াটা চূড়ান্ত হবে।সেজন্য দ্বীনের প্রতিটি ক্ষেত্রে নিজের মতামতকে মূল্য না দিয়ে সাহাবা-তাবেয়ী ও তাবেতাবেঈদের অনুসৃত পথ বেছে নেওয়া হলো বুদ্ধিমানের কাজ।

এটি শুধু যুক্তির কথা নয়; বরং কুরআন-হাদীস ও বিভিন্ন মনীষীদের কথা থেকেও বিষয়টি প্রমাণিত। এখানে এই ধরনের কিছু উল্লেখযোগ্য দলিল নিম্নে উপস্থাপন করা হলো।

আল্লাহ তাআলা কুরআনুল কারীমে ইরশাদ করেন,

وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

আর মুহাজির ও আনসারদের মধ্য হতে যারা অগ্রগামী এবং যারা তাদের অনুসরণ করেছে, আল্লাহ সে সমস্ত লোকদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং তারাও তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছে। তিনি তাদের জন্য প্রস্তুত রেখেছেন বাগ-বাগিচা, যার তলদেশ দিয়ে প্রস্রবণসমূহ প্রবাহিত ।সেখানে তারা থাকবে চিরকাল।এটাই হল মহা সফলতা।(সুরা তাওবা ৯:১০০)

বিশিষ্ট সাহাবী আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ ﷺ থেকে বর্ণিত, রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন,

خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ

> সবচে উত্তম মানুষেরা হলো আমার যুগের মানুষ।অতপর যারা তাদের পরে আগমন করবে।অতপর যারা তাদেরও পরে আসবে।(সহীহ বুখারী : ২৬৫২)

এই হাদিসে প্রথম তিন যুগের মর্যাদার স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। এর দ্বারাই বুঝে আসে, এই যামানার উলামায়ে কিরামের দৃষ্টিভঙ্গিই আমাদের জন্য শিরোধার্য।

আবদুল্লাহ ইবনু আমর রা. থেকে বর্ণিত, রাসূল সা. ইরশাদ করেছেন,

إِنَّ بنِي إسرائيل تَفَرَّقَتْ عَلَى ثِنْتَيْنِ وَسَبْعِينَ
مِلَّةً، وَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى ثَلاَثٍ وَسَبْعِينَ
مِلَّةً، كُلُّهُمْ فِي النَّارِ إِلاَّ مِلَّةً وَاحِدَةً

> নিশ্চয়ই বনী ইসরাইল বাহাত্তর দলে বিভক্ত হয়েছে।আর আমার উম্মত বিভক্ত হবে তিহাত্তর দলে।তাদের সকলেই জাহান্নামে, একটি দল ছাড়া।

সাহাবীরা জিজ্ঞেস করলেন, 'তারা কারা ইয়া রাসূলাল্লাহ!'
তিনি জবাব দিলেন,

مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي

> আমি ও আমার সাহাবীরা যেই পথে আছি (সেই পথে যারা থাকবে তারা জাহান্নামে যবে না। (তিরমিযী : ২৬৪১)

ইরবাস বিন সারিয়া রা. বলেন, রাসূল সা. ইরশাদ করেছেন,

مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ يَرَى اخْتِلاَفًا كَثِيرًا، وَإِيَّاكُمْ
وَمُحْدَثَاتِ الأُمُورِ فَإِنَّهَا ضَلاَلَةٌ فَمَنْ أَدْرَكَ ذَلِكَ
مِنْكُمْ فَعَلَيْهِ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ
الْمَهْدِيِّينَ، عَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ

> তোমাদের মধ্যে যারা বেঁচে থাকবে, তারা বহু বিভেদ-বিসম্বাদ প্রত্যক্ষ করবে।তোমরা (দ্বীনের মধ্যে) নতুন নতুন বিষয় আবিস্কার করা হতে দূরে থাকবে। কেননা তা গোমরাহী। তোমাদের মধ্যে কেউ সেই যুগ পেলে সে যেন আমার সুন্নতে ও সৎপথপ্রাপ্ত খুলাফা রাশেদীনের সুন্নতে অবিচল থাকে। তোমরা এসব সুন্নতকে চোয়ালের দাঁতের সাহায্যে শক্তভাবে আঁকড়ে ধরো।(তিরমিযী : ২৬৭৬)

উপরোক্ত দুই হাদীস দ্বারা বুঝে আসে, বিভেদ-বিচ্ছিন্নতার যুগে সাহাবীদের দেখানো পথেই মুক্তি নিহিত।এর বাইরে অন্য কোন পথ বেছে নিলে গোমরাহিতে পতিত হওয়ার সমূহ আশঙ্কা রয়েছে।

রাসূল ﷺ-এর বিশিষ্ট সাহাবী আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ ﷺ বলেন,

তোমাদের মধ্যে যারা কাউকে অনুসরণ করতে চায় তারা যাতে পরকালে পাড়ি জমানো ব্যক্তিদের অনুসরণ করে। কারণ জীবিত ব্যক্তিরা ফিতনার আশঙ্কা থেকে মুক্ত নয়।এরাই হলো মুহাম্মদ ﷺ-এর সাথীবৃন্দ।তারা এই উম্মতের মধ্যে সবচেয়ে সবচেয়ে স্বচ্ছ অন্তরের অধিকারী। সবচে গভীর ইলমের অধিকারী। সবচেয়ে কম লৌকিকতাসম্পন্ন।তারা এমন ব্যক্তিবর্গ, যাদেরকে আল্লাহ তাআলা তাঁর নবীর সাহচর্যের ও দ্বীন প্রতিষ্ঠার জন্য নির্বাচন করেছেন।সুতরাং তাদের যথাযোগ্য মর্যাদা প্রদান করে তাদের দেখানো পথকে আঁকড়ে ধরো। কারণ তারা সঠিক হেদায়াতের পথে প্রতিষ্ঠিত। (জামিউ বায়ানিল ইলম, ইবনু রজব : ২/৮৭)

বিশিষ্ট সাহাবী হুযাইফা ইবনুল ইয়ামান ﷺ বলেন,

যদি তোমরা তাদের (সালাফদের) অনুসরণ করো, তবে তোমরা অনেক অগ্রসর হবে।আর যদি ডানেবামে সরে যাও তাহলে অনেক বেশি পথভ্রষ্ট হবে।(জামিউ বায়ানিল ইলম, ইবনু রজব : ২/২৯)

ইমাম আবু হানীফা রাহিমাহুল্লাহ বলেন,

সুন্নাহ ও সালাফদের পথ আঁকড়ে ধরা তোমার কর্তব্য।(দ্বীনী বিষয়ে) সব ধরনের নবআবিষ্কৃত বিষয় থেকে সাবধান থাকবে। কারণ তা বিদআত।(সওনুল মানতিক, সুয়ুতী : ৩২২)

ইমাম আওযায়ী রাহিমাহুল্লাহ বলেন,

সালাফদের পদাঙ্ক অনুসরণ করা তোমার কর্তব্য। যদিও লোকেরা তোমাকে পরিত্যাগ করে। (আল-মাদখাল ইলাস সুনান, বাইহাকী : ২৩৩)

আল্লাহ তাআলা আমাদের সবাইকে সালাফদের যথাযোগ্য মর্যাদা দেওয়ার তাওফীক দান করুন। তাদের রেখে যাওয়া ইলমকে মূল্যায়ন করা এবং সেগুলোকে মান্য করার যোগ্যতা দান করুন, আমীন।

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তাআলার জন্য। যিনি জগৎসমূহের প্রতিপালক। দরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক মুহাম্মাদ ﷺ–এর ওপরে এবং তার পরিবারবর্গ ও সাথী–সঙ্গীদের ওপরে। অত্র পুস্তিকায় ইলম এবং তা উপকারী ও অনুপকারী এই দুই ভাগে বিভক্ত হওয়া বিষয়ে সামান্য কিছু কথা উপস্থাপন করব। সেই সাথে পূর্ববর্তী মনীষীদের ইলম যে পরবর্তী লোকদের ইলমের ওপরে মর্যাদাপূর্ণ সে বিষয়েও আমি আলোকপাত করব। আল্লাহর সাহায্য চেয়ে শুরু করছি। যিনি ছাড়া কোনো ভরসা নেই। কোনো শক্তি নেই।

ইলমের শ্রেণিবিভাগ

কখনো আল্লাহ তাআলা তার কিতাবে ইলমকে প্রশংসনীয় ক্ষেত্রে উল্লেখ করেছেন। এটি হলো উপকারী ইলম। আবার কখনো নিন্দনীয় ক্ষেত্রে উল্লেখ করেছেন। এটি হলো অনুপকারী ইলম। উপকারী ইলমবিষয়ক আয়াতসমূহ পবিত্র কুরানে আল্লাহ তাআলা উপকারী ইলমকে বিভিন্ন আয়াতে কারিমায় তুলে ধরেছেন। নিচে সেগুলো উপস্থাপিত হলো।

প্রথম আয়াত:

قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

বলুন, যাদের ইলম আছে আর যাদের ইলম নেই তারা কি সমান?[১]

দ্বিতীয় আয়াত:

شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ

আল্লাহ তাআলা সাক্ষ্য দিচ্ছেন, তিনি ছাড়া কোনো উপাস্য নেই। ফেরেশতারা এবং ইলমের অধিকারী ন্যায়নিষ্ঠ ব্যক্তিবর্গও সাক্ষ্য দিচ্ছেন, তিনি ছাড়া কোনো উপাস্য নেই।[২]

তৃতীয় আয়াত:

وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا

বলুন, হে আমার রব, আমার ইলম বাড়িয়ে দাও।[৩]

চতুর্থ আয়াত:

إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ

[১] সূরা যুমার (৩৯): ৯

[২] সূরা আল ইমরান (০৩): ১৮

[৩] সূরা ত্বহা (২০): ১১৪

আল্লাহর বান্দাদের মধ্য হতে কেবল ইলমের অধিকারী ব্যক্তিরাই আল্লাহকে ভয় করে।[১]

পঞ্চম আয়াত:

যেখানে আদম আলাইহিস সালামের ঘটনা আল্লাহ তাআলা কুরআনে বর্ণনা করেছেন যে, তাঁকে সব ধরনের নামসমূহ শিক্ষা দিয়ে সেগুলো যখন ফেরেশতাদের সামনে উপস্থাপন করা হলো তখন তারা বলেছিল,

سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ

আপনি তো মহান! আপনি আমাদের যা শিখিয়েছেন এর বাইরে আমাদের কোনো ইলম নেই। নিশ্চয়ই আপনি মহাজ্ঞানী, প্রজ্ঞাময়।[২]

পঞ্চম আয়াত:

যেখানে আল্লাহ তাআলা মুসা আ. এর ঘটনা উল্লেখ করেছেন। মুসা আ. খিযির আ.কে উদ্দেশ করে বলেছিলেন,

هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَى أَنْ تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا

আমি কি আপনার অনুসরণ করব এই শর্তে যে, আপনাকে যে সঠিক পথের ইলম দেওয়া হয়েছে তা থেকে আপনি আমাকে শিক্ষা দেবেন?[৩]

[১] সূরা ফাতির (৩৫): ২৮

[২] সূরা বাকারা (০২): ৩২

[৩] সূরা কাহাফ (১৮): ৬৬

অনুপকারী ইলম

অনেক এমন লোকের কথাও জানা যায়, যাদের ইলম প্রদান করা হলেও সে ইলম তাদের কোনো উপকারে আসেনি। এ-জাতীয় ইলম যদিও প্রকৃতপক্ষে উপকারী, কিন্তু যাকে তা দেওয়া হয়েছে সে উপকৃত হতে পারেনি। কুরআনে এর বেশ কয়েকটি উদাহরণ রয়েছে।

প্রথম আয়াত:

مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْرَاةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ
الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا بِئْسَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا
بِآيَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ

যাদের তাওরাত দেওয়া হয়েছিল, অতঃপর তারা তার অনুসরণ করেনি, তারা সেই গাধার ন্যায়, যে পুস্তক বহন করে। যারা আল্লাহর আয়াতসমূহকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে তাঁদের দৃষ্টান্ত কতই-না নিকৃষ্ট! আল্লাহ্ জালেম সম্প্রদায়কে পথ প্রদর্শন করেন না।[১]

দ্বিতীয় আয়াত:

وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا
فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ ـ وَلَوْ شِئْنَا
لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ

আর আপনি তাঁদের শুনিয়ে দিন সে লোকের অবস্থা, যাকে আমি নিজের নিদর্শনসমূহ দান করেছিলাম। অথচ সে তা পরিহার করে বেরিয়ে গেছে। আর তার পেছনে লেগেছে শয়তান। ফলে সে পথভ্রষ্টদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়েছে। অবশ্য

[১] সূরা জুমুআ (৬২): ৫

আমি চাইলে সে সকল নিদর্শনের বদৌলতে তার মর্যাদা বাড়িয়ে দিতে পারতাম। কিন্তু সে তো অধঃপতিত ও আপন রিপুর অনুগামী হয়ে পড়ে রইল।[১]

তৃতীয় আয়াত:

فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَرِثُوا الْكِتَابَ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَذَا الْأَدْنَى وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا وَإِنْ يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِثْلُهُ يَأْخُذُوهُ

অতঃপর তাঁদের পরে এসেছে এমন কিছু অপদার্থ, যারা কিতাবের উত্তরাধিকারী হয়েছে। তারা নিকৃ পার্থিব উপকরণ আহরণ করছে এবং বলছে, আমাদের ক্ষমা করে দেওয়া হবে। বস্তুত এমন ধরনের উপকরণ যদি আবারও তাঁদের সামনে উপস্থিত হয় তবে তারা তাও তুলে নেবে।[২]

চতুর্থ আয়াত:

وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ

আল্লাহ তাআলা তাকে ইলম থাকা সত্ত্বেও পথভ্র করেছেন।[৩]

অবশ্য এটা তখন এই বিষয়ের উদাহরণ হবে যখন ইলম দ্বারা পথভ্রষ্ট ব্যক্তির ইলম উদ্দেশ্য নেওয়া হবে। (আর যদি আল্লাহর ইলম উদ্দেশ্য হয় তখন আর আলোচ্য বিষয়ের উদাহরণ হবে না। কারণ, তখন অর্থ হবে, আল্লাহ তাআলা তাকে জেনেশুনে পথভ্রষ্ট করেছেন।

[১] সূরা আ'রাফ (০৭): ১৭৫-৭৬

[২] সূরা আরাফ (০৭): ১৬৯

[৩] সূরা জাসিয়া (৪৫): ২৩

নিন্দনীয় ইলম

আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনের যেসব আয়াতে নিন্দনীয় ইলমের উল্লেখ করেছেন সেগুলো নিচে প্রদত্ত হলো।

প্রথম আয়াত:

وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا
لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ

তারা এমন ইলম অর্জন করে যা তাঁদের ক্ষতি বৈ উপকার করে না। তারা ভালো করে জানে, নিশ্চয়ই যারা জাদু অবলম্বন করে আখেরাতে তাদের কোনো অংশ নেই।[১]

দ্বিতীয় আয়াত:

فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَرِحُوا بِمَا عِنْدَهُمْ
مِنَ الْعِلْمِ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ

তাদের কাছে যখন তাদের রাসূলগণ স্পষ্ট প্রমাণাদিসহ আগমন করেছিল, তখন তারা নিজেদের ইলমের দম্ভ প্রকাশ করেছিল। তারা যে বিষয় নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করেছিল, তাই তাদের গ্রাস করে নিয়েছিল।[২]

তৃতীয় আয়াত:

يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ

দুনিয়ার জীবনের বাহ্যিক বিষয়ের ইলম তাদের রয়েছে। অথচ আখেরাত সম্পর্কে তারা উদাসীন।[৩]

[১] সূরা বাকারা (০২): ১০২
[২] সূরা মুমিন (৪০): ৮৩
[৩] সূরা রুম (৩০): ৭

হাদীসের আলোকে ইলমের শ্রেণিবিভাগ

হাদীস শরীফেও ইলমকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে। উপকারী ও অনুপকারী। আল্লাহ তাআলা আমাদের অনুপকারী ইলম থেকে রক্ষা করুন এবং উপকারী ইলম দান করুন।

সহীহ মুসলিমে সাহাবী যায়েদ ইবনে আরকাম ﵁ থেকে বর্ণিত আছে, রাসূল ﷺ বলতেন,

اللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُبِكَ مِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعْ، وَمِنْ قَلْبٍ لَا يَخْشَعْ، وَمِنْ نَفْسٍ لَا تَشْبَعْ، وَ مِنْ دَعْوَةٍ لَا يُسْتَجَابُ لَهَا

> হে আল্লাহ, আমি আপনার কাছে অনুপকারী ইলম, অবিনত অন্তর, অপরিতৃপ্ত আত্মা এবং অগ্রহণযোগ্য দোআ থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।[১]

সুনানের চারও ইমাম তাদের গ্রন্থে বিভিন্ন সূত্রে হাদীসটি উল্লেখ করেছেন। যার কোনোটাতে আছে, এমন দোআ থেকে, যা শোনা হয় না। কোনো বর্ণনায় আছে, তোমার থেকে এই চারোটি বিষয় থেকে পানাহ চাই।

ইমাম নাসায়ী ﵀ জাবের ﵁ থেকে বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলতেন,

اللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْئَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا وَ أَعُوْذُبِكَ مِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ

> হে আল্লাহ, আমি আপনার কাছে উপকারী ইলম প্রার্থনা করছি। এবং অনুপকারী ইলম থেকে আশ্রয় চাচ্ছি।[২]

ইবনে মাজাহ ﵀ যে শব্দে হাদীসটি উল্লেখ করেছেন সেখানে আছে, রাসূল ﷺ ইরশাদ করেছেন,

اسَلُوْا اللّٰهَ عِلْمًا نَافِعًا وَ تَعَوَذُّوْا بِاللّٰهِ مِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ

[১] *সহীহ মুসলিম*, হাদীস নং: ২৭২২

[২] লেখক ইমাম নাসায়ী ﵀ এর কথা বললেও হাদীসটি ঠিক এই শব্দে তাঁর কিতাবে নেই; বরং হুবহু এই শব্দে এটি বর্ণনা করেছেন ইবনে হিব্বান ﵀ তার *সহীহ* গ্রন্থে। হাদীস নং: ৮২।

> আল্লাহর কাছে উপকারী ইলমের প্রার্থনা করো। এবং অপকারী ইলম থেকে পানাহ চাও।[১]

ইমাম তিরমিজী ﷺ আবু হুরাইরা ﷺ এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন, রাসূল ﷺ বলতেন,

اللَّهُمَّ انْفَعْنِي بِمَا عَلَّمْتَنِي وَعَلِّمْنِي مَا يَنْفَعُنِي، وَزِدْنِي عِلْمًا

> হে আল্লাহ, তুমি আমাকে তোমার প্রদত্ত ইলম দ্বারা উপকৃত করো, আমাকে উপকারকারী ইলম শিক্ষা দাও এবং আমার ইলম বৃদ্ধি করো।[২]

ইমাম নাসায়ী ﷺ আনাস ﷺ থেকে বর্ণনা করেন, রাসূল ﷺ এভাবে দুআ করতেন,

اللَّهُمَّ انْفَعْنِي بِمَا عَلَّمْتَنِي، وَعَلِّمْنِي مَا
يَنْفَعُنِي، وَارْزُقْنِي عِلْمًا تَنْفَعُنِي بِهِ

> হে আল্লাহ, তুমি আমাকে তোমার প্রদত্ত ইলম দ্বারা উপকৃত করো, আমাকে উপকারকারী ইলম শিক্ষা দাও এবং উপকারী ইলম প্রদান করো।[৩]

আবু নুয়াইম ﷺ আনাস ﷺ থেকে বর্ণনা করেন, রাসূল ﷺ বলতেন,

اللّهُمَّ إِنَّا نَسْئَلُكَ إِيْمَانًا دَائِمًا، فَرُبَّ إِيْمَانٍ غَيْرُ
دَائِمٍ، وَأَسْئَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا، فَرُبَّ عِلْمٍ غَيْرُ نَافِعٍ

> হে আল্লাহ, আমরা আপনার কাছে স্থায়ী ঈমান প্রার্থনা করছি। (কারণ,) অনেক ঈমান অস্থায়ী। এবং আপনার কাছে উপকারী ইলম প্রার্থনা করছি। (কারণ,) অনেক ইলম অনুপকারী।[৪]

ইমাম আবু দাউদ ﷺ সাহাবী বুরাইদা ﷺ থেকে বর্ণনা করেন, রাসূল ﷺ বলেছেন,

---

[১] *সুনানে ইবনে মাজাহ*, হাদীস নং: ৩৮৪৩

[২] হাদীস নং: ৩৫৯৯

[৩] *সুনানে কুবরা*, হাদীস নং: ৭৮১৯

[৪] *হিলইয়াতুল আওলিয়া*, ৬/১৭৯

إِنَّ مِنَ الْبَيَانِ سِحْرًا، وَإِنَّ مِنَ الْعِلْمِ جَهْلًا

| নিশ্চয় কিছু কথা জাদু আর কিছু ইলম অজ্ঞতা

ইবনে সওহান ﷺ 'কিছু ইলম অজ্ঞতা' এই কথার ব্যাখ্যায় বলেছেন, এর মানে হলো, কোনো আলেমের একটা বিষয়ে ইলম না থাকা সত্ত্বেও তা জানার ভান করা। ফলে সেই বিষয়টা তার অজানাই থেকে যায়।[১]

এর অন্য আরেকটি ব্যাখ্যা করা হয়। তা হলো, যে ইলম উপকারের পরিবর্তে ক্ষতি করে তা একধরনের অজ্ঞতাই। কারণ, এমন ইলম থাকার চেয়ে না থাকাই ভালো। তাই এই দিক বিবেচনায় এটি সাধারণ অজ্ঞতার চেয়েও বেশি নিকৃষ্ট। এর উদাহরণ হলো জাদু। যা দ্বীন-দুনিয়া উভয় ক্ষেত্রে ক্ষতিকর ইলম।

---

[১] *সুনানে আবু দাউদ*, হাদীস নং: ৫০১২

কিছু অনুপকারী ইলম

রাসূল ﷺ থেকে অনুপকারী কিছু ইলমের ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। মারাসিলে আবূ দাউদে যায়দ ইবনে আসলাম ﷺ থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেছেন, "রাসূল ﷺকে বলা হল, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ, অমুকে কত্তো ইলমের অধিকারী!'

তিনি বললেন, 'কোন বিষয়ে?'

তারা বলল, 'মানুষের বংশধারা বিষয়ে।'

তখন তিনি বললেন, 'এটি অনুপকারী ইলম। যা না জানা থাকলেও তেমন কোনো ক্ষতি হয় না।"[১]

আবূ নুয়াইম ﷺ তাঁর রিয়াযাতুল মুতাআল্লিমীন গ্রন্থে বাকিয়্যা ইবনে জুরাইজ থেকে, তিনি আতা থেকে, তিনি আবু হুরাইরা থেকে হাদীসটি মারফু সূত্রে বর্ণনা করেছেন। সেখানে আছে, তারা বলল, 'সে আরবদের বংশধারা, কবিতা এবং যুদ্ধ-বিগ্রহ সম্পর্কে সবচেয়ে বেশি ইলম রাখে।'

এই হাদীসের শেষে আরও কিছু অংশ অতিরিক্ত আছে। তা হলো,

اَلْعِلْمُ ثَلَاثَةٌ مَا خَلَاهُنَّ فَهُوَ فَضْلٌ: آيَةٌ مُحْكَمَةٌ، أَوْ سُنَّةٌ قَائِمَةٌ، أَوْ فَرِيْضَةٌ عَادِلَةٌ

> ইলম তিনটি জিনিস। এ ছাড়া বাকি সবই অতিরিক্ত বিষয়। এক. সুস্পষ্ট আয়াত, দুই. প্রতিষ্ঠিত সুন্নাহ, তিন. মৃত ব্যক্তির মীরাস তার ওয়ারিসদের মধ্যে ইনসাফ ভিত্তিক বন্টন।[২]

আবূ দাউদ ﷺ ও ইবনে মাজাহ ﷺ আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস ﷺ থেকে মারফু সূত্রে অন্য আরেকটি হাদীস বর্ণনা করেছেন। তা হল,

العلم ثلاثة ما سوي ذلك فهو فضل: آية محكمة، أو سنة قائمة، أو فريضة عادلة

[১] আল-জামি, ইবনু ওয়াহব : ৩১

[২] জামিউ বয়ানিল ইলম, ইবনে আবদুল বার, ২/২৩

> ইলম তিনটি জিনিস। এ ছাড়া বাকি সবই অতিরিক্ত বিষয়। এক: সুস্পষ্ট আয়াত, দুই: প্রতিষ্ঠিত সুন্নাহ, তিন: মৃত ব্যক্তির মীরাস তার ওয়ারিসদের মধ্যে ইনসাফভিত্তিক বণ্টন।[১]

এই হাদীসের সনদে আব্দুর রহমান ইফ্রিকী রয়েছেন। তাঁর দুর্বলতার বিষয়টি প্রসিদ্ধ।

আবু হুরাইরা ﷺ এর সূত্রে রাসূল ﷺ থেকে আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখতে সহায়ক হয় এই পরিমাণ বংশধারা সম্পর্কীয় জ্ঞান অর্জন করার নির্দেশ পাওয়া যায়। তিনি বলেছেন,

تَعَلَّمُوْا مِنْ أَنْسَابِكُمْ مَا تَصِلُوْنَ بِه أَرْحَامَكُمْ

> তোমরা সেই পরিমাণ বংশধারা সম্পর্কীয় ইলম অর্জন করো, যার মাধ্যমে আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখতে সহায়ক হয়।[২]

হুমাইদ ইবনে যানজুইয়াহ ﷺ আবু হুরাইরা ﷺ থেকে মারফু সূত্রে অন্য সনদে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। সেটি হলো,

تَعَلَّمُوْا مِنْ أَنْسَابِكُمْ مَا تَصِلُوْنَ بِه أَرْحَامَكُمْ ثُمَّ انْتَهُوْا،
وَتَعَلَّمُوْا مِنَ الْعَرَبِيَّةِ مَا تَعْرِفُوْنَ بِه كِتَابَ اللهِ ثُمَّ انْتَهُوْا،

> তোমরা আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখতে পারো এই পরিমাণ বংশধারা সম্পর্কীয় ইলম অর্জন করে ক্ষান্ত হও। আল্লাহর কিতাব বুঝতে সক্ষম হও এই পরিমাণ আরবী ভাষার ইলম অর্জন করে বিরত হও। জলে-স্থলের অন্ধকারে পথ চলতে পারো এই পরিমাণ জ্যোতির্বিজ্ঞানের ইলম অর্জন করে নিবৃত হও।[৩]

এই হাদীসের সনদে ইবনে লাহীয়া নামক রাবী আছে। (তিনি দুর্বল)

নুআইম ইবনে আবী হিন্দের বর্ণনায় এসেছে, উমর ﷺ বলেছেন,

> জলে-স্থলের অন্ধকারে পথ চলতে পারো এই পরিমাণ জ্যোতির্বিজ্ঞানের ইলম অর্জন করে নিবৃত হও। আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখতে পারো এই পরিমাণ বংশধারা সম্পর্কীয় ইলম অর্জন করো। যেসব

[১] *সুনানে আবু দাউদ*, হাদিস নং: ২৮৮৫; *সুনানে ইবনে মাজাহ*, হাদিস নং: ৫৪
[২] *সুনানে তিরমিজী*, হাদীস নং: ১৯৭৯
[৩] শুয়াবুল ঈমান, বাইহাকী, হাদিস নং: ১৭২৩

> মহিলাদের তোমাদের জন্য হালাল করা হয়েছে ও যাদের তোমাদের ওপর হারাম করা হয়েছে তাদের সম্পর্কেও ইলম অর্জন করো। অতঃপর ক্ষান্ত হও।

মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহ থেকে মিসআর বর্ণনা করেছেন যে, উমর ﷺ বলেছেন,

> তোমরা জ্যোতির্বিদ্যার ততটুকু শেখো যার দ্বারা কেবলা ও রাস্তা চিনতে পারো।

ইবরাহীম নাখয়ী ﷺ পথ খুঁজে পেতে সহায়ক হয় পরিমাণ জ্যোতির্বিদ্যা শেখার ক্ষেত্রে কোনো সমস্যা আছে বলে মনে করতেন না।

ইমাম আহমাদ ﷺ ও ইসহাক ﷺ চন্দ্রের কক্ষপথ সম্পর্কে ইলম অর্জন করা বৈধ হওয়ার মত পোষণ করতেন। ইসহাক ﷺ আরও বলেছেন,

> যেসব নক্ষত্রের মাধ্যমে পথ চিনতে সহজ হয় সেগুলোর নামের বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করা যাবে।

তবে কাতাদাহ ﷺ চন্দ্রের কক্ষপথ বিষয়ক জ্ঞান অর্জনকে অপছন্দ করতেন। আর ইবনে উআইনা ﷺ এই বিষয়ে কোনো অনুমতিই দিতেন না। তাদের দুজন থেকে হারব এমনটি বর্ণনা করেছেন।

বিখ্যাত তাবেয়ী তাউস ﷺ বলেছেন,

> অনেক জ্যোতির্বিজ্ঞানী ও সংখ্যাতত্ত্ববিদ এমন রয়েছে, আল্লাহর দরবারে যাদের কোনো দাম নাই।

হারব এটি বর্ণনা করেছেন। হুমাইদ ইবনে যানজুয়াহ এটি তাউসের সূত্রে সাহাবী আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন।

এই নিষেধাজ্ঞা ও নিন্দাবাদ জ্ঞাপনকে সেই ক্ষেত্রে প্রযোজ্য বলে ধরা হবে, যেখানে এগুলোর ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া আছে বলে বিশ্বাস করা হয়। আর যেখানে কেবলই পথ চলার সুবিধার্থে এই ইলম অর্জন করা হয় সেখানে একে নিন্দনীয় ধরা হবে না। কারণ, প্রথমটা বিশ্বাস করা হারাম। এই বিষয়ে মারফু হাদীসও বর্ণিত হয়েছে। রাসূল ﷺ ইরশাদ করেছেন,

مَنْ اقْتَبَسَ شُعْبَةً مِنَ النُّجُوْمِ فَقَدِ
اقْتَبَسَ شُعبةً مِنَ السِّحْرِ

> যে ব্যাক্তি জ্যোতির্বিদ্যার কোনো অংশের জ্ঞান অর্জন করল সে মূলত জাদুবিদ্যারই একটা অংশ শিখল।[১]

ইবনে আব্বাস ﷺ এর সূত্রে আবু দাউদ ﷺ এটি বর্ণনা করেছেন। ইমাম আবু দাউদ ﷺ সাহাবী কুবাইসা ﷺ এর সূত্রে আরেকটি মারফু হাদীস উল্লেখ করেছেন। তা হলো,

العَافِيَةُ و الطِّيَرَةُ و الطرق مِنَ الجِبْتِ و الْعَافِيَة
زجر الطير و الطرق: الخَطُّ فِي الطَّرِيْق

> পাখির সাহায্যে কোনো কিছুর ভালো-মন্দ নির্ণয় করা, কোনো কিছুকে অশুভ লক্ষণ ভাবা এবং মাটিতে রেখা টেনে শুভ-অশুভ নির্ণয় করা কুফুরি।

'আত-তারক' হচ্ছে মাটিতে রেখা টানা। আর 'ইয়াফা' অর্থ হচ্ছে, কঙ্কর নিক্ষেপকরেশুভ-অশুভনির্ণয়করা।[২]

সুতরাং নক্ষত্রের প্রভাব বিষয়ক জ্ঞান অর্জন হারাম ও বাতিল। এবং এই অনুযায়ী আমল করা, যেমনঃ নক্ষত্রের নৈকট্য অর্জন করার চেষ্টা করা ইত্যাদি হলো কুফুরী। পারতপক্ষে যে জ্ঞান অর্জন করা হয় পথ খুঁজে পাওয়া, কেবলা চেনা ও ঠিকঠাক রাস্তায় চলার জন্য, সেটা প্রয়োজন অনুপাতে শেখা হলে তখন তা সংখ্যাগরিষ্ঠ আলেমদের মতে বৈধ। এর অতিরিক্ত শেখার তেমন কোনো দরকার নেই। এটি এরচেয়েও আরও বেশি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় থেকে মানুষকে বিমুখ করে দেয়।

[১] *সুনানে আবু দাউদ*, হাদীস নংঃ ৩৯০৫
[২] *সুনানে আবু দাউদ*, হাদীস নংঃ ৩৯০৭

অনেক সময় এসব নিয়ে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম গবেষণা বিভিন্ন শহরে মুসলিমদের কেবলা সম্পর্কে মন্দ ধারণা সৃষ্টি করে। যেমন: এই জ্ঞান চর্চাকারীদের অনেকের ক্ষেত্রে এমনটা অতীতে ও বর্তমান যুগে ঘটেছে। এটা নিয়ে মাত্রাতিরিক্ত চিন্তা-ভাবনা এমন বিশ্বাসের জন্ম দিয়ে থাকে যে, কিছু শহরে সাহাবী ও তাবেয়ীদের সালাত ভুল হয়েছে। অথচ তা ভ্রান্ত কথা।

ইমাম আহমাদ ﵀ রাশিচক্রের দশম মকর রাশির দ্বারা প্রমাণ গ্রহণকে অপছন্দ করে বলেছেন, হাদীসে এসেছে,

مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَ الْمَغْرِبِ قِبْلَةٌ

| পূর্ব ও পশ্চিমের মাঝে হলো কিবলা।[১]

অর্থাৎ তিনি মকর রাশিসহ অন্যান্য নক্ষত্রকে ধর্তব্যে আনেননি। ইবনে মাসউদ ﵁ কাব ﵁ এর এই কথার নিন্দা করেছেন যে, আকাশ ঘুরতে থাকে। ইমাম মালেক ﵀ সহ অন্যরাও এর নিন্দা করেছেন। ইমাম আহমদ ﵀ জ্যোতির্বিদদের এই কথার নিন্দা করেছেন যে, শহরসমূহে দ্বিপ্রহরে তারতম্য ঘটে থাকে।

অনেক সময় তারা নিন্দা করতেন এই কারণে যে, রাসূলরা এসব বিষয় নিয়ে কখনো কথা বলেননি। তা ছাড়া অনেক সময় এসব নিয়ে বেশি ঘাঁটাঘাঁটি করাটা ফাসাদেরও কারণ হয়ে থাকে। কারণ, দেখা গেছে জ্যোতির্বিদ্যায় পারদর্শী অনেকে রাতের শেষ তৃতীয়াংশে আল্লাহর নিম্ন আকাশে অবতরণ করার হাদীসের বিষয়ে আপত্তি করে বলে থাকেন, 'রাতের এক-তৃতীয়াংশ একেক দেশে একেক সময়ে হয়ে থাকে। সুতরাং নির্দিষ্ট একটি সময়ে এই অবতরণ সম্ভব নয়।' অথচ এই ধরনের আপত্তির অপছন্দনীয়তা আমাদের কাছে আজানা নয়। যদি আল্লাহর রাসূল ﷺ বা খুলাফায়ে রাশেদীন কাউকে এমন আপত্তি করতে শুনতেন তবে তার সাথে কথা না বাড়িয়ে বরং তাকে শাস্তিপ্রদানে উদ্যোগী হতেন এবং তাকে মুনাফিক হিসাবে আখ্যায়িত করতেন।

---

[১] *সুনানে তিরমিজী*, হাদীস নং: ৩৪২

এমনিভাবে বংশধারার ইলমও খুব বেশি প্রয়োজনীয় নয়। উমর ﷺ ও অন্যান্য আরও অনেকের থেকে এই বিষয়ে নিষেধাজ্ঞার কথা আমরা ইতিপূর্বে জেনে এসেছি। তবুও দেখা যায় সাহাবী ও তাবেয়ীদের একটা জামাত এই বিষয়ে জ্ঞান রাখতেন এবং এর প্রতি যত্নশীল ছিলেন।[১]

এমনিভাবে আরবী ভাষা ও ব্যাকরণ নিয়ে মাত্রাতিরিক্ত গবেষণা এরচেয়ে আরও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় থেকে মানুষকে বিমুখ করে দেয়।এর পেছনে পড়ে থাকলে অন্যান্য উপকারী ইলম থেকে বঞ্চিত হতে হয়।

কাসেম ইবনে মুখাইমারা ﷺ 'ইলমুন নাহব' বা আরবী ব্যাকরণবিদ্যাকে অপছন্দ করে বলেছেন, 'এটি ব্যস্ততা দিয়ে শুরু হয় এবং অবাধ্যতা দিয়ে শেষ হয়।' এর দ্বারা তিনি মূলত এই বিদ্যায় অধিক পরিমাণে ঝুঁকে পড়ার প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। এই কারণেই ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল ﷺ আরবী ভাষা ও এর ব্যাকরণ বিষয়ে অতিমাত্রায় জানাকে অপছন্দ করতেন।

আবু উবাইদ ﷺ এর অতিরিক্ত ব্যাকরণচর্চার সমালোচনা করে তিনি বলেছেন,

> তিনি ব্যাকরণ নিয়ে ব্যস্ত থেকে এর চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় থেকে বিমুখ হয়ে আছেন।

এই কারণেই বলা হয়ে থাকে, কথার মধ্যে ব্যাকরণের অবস্থান তেমন যেমন খাবারের মধ্যে লবণের অবস্থান। অর্থাৎ ব্যাকরণ সেই পরিমাণ দরকার, যতটুকু হলে কথার শুদ্ধতা রক্ষা করা যায়। যেভাবে ততটুকু লবণ তরকারিতে দেওয়া হয়ে থাকে, যতটুকু হলে খাবারের স্বাদ ঠিক থাকে। এরচেয়ে অতিরিক্ত হলে খাবার বিস্বাদ হয়ে যায়।

এমনিভাবে অঙ্কবিদ্যার ক্ষেত্রেও ততটুকু শেখা প্রয়োজন, যার মাধ্যমে উত্তরাধিকার সম্পদ বণ্টনসহ অন্যান্য সম্পদের হিসাবনিকাশ করা যায়। কেবলই মস্তিষ্ককে শানিত করার জন্য এর পেছনে অতিরিক্ত সময় ব্যস্ত থাকা এর চেয়েও আরও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় থেকে মানুষকে বিমুখ করে দেয়।

সাহাবায়ে কেরামের পরে অনেক ধরনের জ্ঞানের উদ্ভব হয়েছে এবং লোকেরা এর পেছনে প্রচুর সময় ব্যয় করে থাকে। তারা সেগুলোকে প্রকৃত

---

[১] এদের মধ্যে অন্যতম হলেন আবু বকর ﷺ। তাঁর বিষয়ে রাসূল ﷺ বলেছেন,

إِنَّ أَبَا بَكْرٍ أَعْلَمُ قُرَيْشٍ بِأَنْسَابِهَا

"নিশ্চয় আবু বকর কুরাইশদের মধ্যে বংশধারা সম্পর্কে সবচেয়ে বেশি অবগত।" *সহীহ মুসলিম*, হাদীস নং: ২৪৯০

জ্ঞান আখ্যায়িত করে মনে করে, এসব বিষয়ে জানা না থাকাটা হলো মূর্খতার পরিচায়ক। নিঃসন্দেহে এগুলো বিদআত বলে গণ্য হবে। হাদীসে এসব থেকে নিষেধ করা হয়েছে। এর উদাহরণ হলো, মুতাজিলা গোষ্ঠী কর্তৃক উদ্ভাবিত কদর ও আল্লাহর জন্য উপমাপ্রদান বিষয়ক তর্ক-বিতর্ক। অথচ হাদীস শরীফে কদর নিয়ে বেশি ঘাঁটাঘাঁটি করতে নিষেধ করা হয়েছে। সহীহ ইবনে হিব্বান ও মুস্তাদরাকে হাকেমে বিশিষ্ট সাহাবী আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস ﵄ থেকে মারফু সূত্রে বর্ণিত হয়েছে,

لَا يَزَالُ أَمْرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ مُوَائِمًا أَوْ مُقَارِبًا
مَا لَمْ يَتَكَلَّمُوا فِي الْوِلْدَانِ وَالْقَدَرِ

> এই উম্মতের অবস্থা ততদিন পর্যন্ত যথাযথ বা ভারসাম্যপূর্ণ থাকবে, যতদিন তারা (গর্ভস্থ) সন্তানাদি ও কদর নিয়ে কথা না বলবে।[১]

এই হাদীসটি মাওকুফ সূত্রেও বর্ণিত হয়েছে। অনেকে মাওকুফ হওয়াকেই বেশি প্রাধান্য দিয়েছেন। ইমাম বাইহাকী ﵀ সাহাবী আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ ﵁ থেকে মারফু সূত্রে বর্ণনা করেন,

إِذَا ذُكِرَ أَصْحَابِي فَأَمْسِكُوا، وَإِذَا ذُكِرَ النُّجُومُ فَأَمْسِكُوا

> যখন আমার সাহাবীর বদনাম করা হয় তখন নিষেধ করো। এবং যখন নক্ষত্রের আলোচনা করা হয় তখনো নিষেধ করো।[২]

এটি আরও বেশ কয়েকটি সনদে বর্ণিত হয়েছে। তবে সেগুলো ত্রুটিমুক্ত নয়।

আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস ﵄ থেকে বর্ণিত আছে, তিনি মায়মুন ইবনে মিহরানকে বলেছেন,

> জ্যোতির্বিদ্যা চর্চা থেকে সাবধান। কেননা, এটি মানুষকে গণকবিদ্যার দিকে ধাবিত করে। কদর নিয়ে বেশি চিন্তা-ভাবনা করা থেকেও সাবধান। কেননা, এটি মানুষকে ধর্মদ্রোহিতার দিকে নিয়ে যায়। রাসূল ﷺ-এর কোনো সাহাবীকে গালি দেওয়া থেকেও সাবধান থাকবে। অন্যথায় আল্লাহ তাআলা তোমাকে উল্টোমুখী করে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন।[৩]

আবু নুয়াইম ﵀ এটি মারফু হিসাবে উল্লেখ করেছেন। তা সঠিক নয়।

---

[১] *সহীহ ইবনে হিব্বান*, হাদীস নং: ৬৭২৪; *মুস্তাদরাকে হাকেম*, হাদীস নং: ৯৩

[২] *মাজমাউয যাওয়ায়েদ*, ৭/২০২, হাদীস নং: ১১৮৫১

[৩] *তারীখে জুরজান*: ৪২৯

কদর নিয়ে বেশি চিন্তা-ভাবনা নিষেধ হবার কারণ

কদর নিয়ে বেশি চিন্তা-ভাবনা করা নিষেধ হবার কয়েকটি দিক হতে পারে।

- কুরআনের এক অংশকে অপর অংশের মাধ্যমে বাতিল করা। ফলে এক আয়াতের মাধ্যমে কদরকে সাব্যস্তকারী দলিলকে বাদ দেওয়া হবে বা তার উল্টোটা করা হবে। ফলে দুই পক্ষের মধ্যে ঝগড়ার উদ্ভব হবে। এই বিষয়ে বর্ণিত আছে যে, রাসূল ﷺ-এর যামানায় এমন একটি ঘটনা ঘটেছিল। ফলে তিনি রাগ হয়ে এমন করতে নিষেধ করে দেন।[১] এটা মূলত কুরআন নিয়ে বিবাদ করারই অন্তর্ভুক্ত। এর থেকে আমাদের নিষেধ করা হয়েছে।

- শুধু বিবেক-বুদ্ধির ওপর অনুমান করে কদরের পক্ষে-বিপক্ষে আলোচনায় লিপ্ত হওয়া। যেমন, কাদরিয়া গোষ্ঠী বলে থাকে, 'যদি সবকিছু পূর্বনির্ধারিত হয়ে থাকে এবং সেভাবেই সব সংঘঠিত হয়ে থাকে তারপর কাউকে শাস্তি প্রদান করা হয় তবে তা অবশ্যই জুলুম বলে বিবেচিত হবে।' এর বিপরীতে কাদরিয়া গোষ্ঠীর বিরোধিতাকারীরা বলে থাকে, 'আল্লাহ তাআলা বান্দাদের কাজ করতে বাধ্য করে থাকেন।'[২]

- কদর-রহস্যের সমুদ্রে ডুব দেওয়া। আলী رضي الله عنه সহ আরও অনেক সালাফ থেকে এই বিষয়ে নিষেধাজ্ঞা বর্ণিত হয়েছে। কারণ, বান্দার পক্ষে এর নিগুঢ় রহস্য উদ্ঘাটন কখনো সম্ভব নয়। মুতাজিলা গোষ্ঠী ও তাদের পদাঙ্ক অনুসরণকারীদের উদ্ভাবিত আরেকটা জিনিস হলো, আল্লাহ তাআলার সত্তা ও গুণাবলি বিষয়ে বুদ্ধির সহায়তা নিয়ে কথা বলা। এটি কদর নিয়ে আলোচনা করার চেয়েও বেশি ক্ষতিকর ও

---

[১] লেখক মূলত আবদুল্লাহ ইবনে আমর رضي الله عنه থেকে বর্ণিত একটি ঘটনার দিকে ইঙ্গিত করেছেন। তা হলো, একবার রাসূল ﷺ দুই ব্যক্তির আওয়াজ শুনতে পেলেন যারা একটি আয়াত নিয়ে বিবাদে লিপ্ত হয়েছিল। তখন তিনি রাগত চেহারায় আমাদের কাছে এসে বললেন, "কেবল আল্লাহর কিতাব নিয়ে বিবাদে লিপ্ত হবার কারণেই তোমাদের পূর্ববর্তীরা ধ্বংস হয়েছে।" *সহীহ মুসলিম*, হাদীস নং: ২৬৬৬

[২] অর্থাৎ বান্দা হলো পুতুলের মতো। তার নিজের স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি বলতে কিছু নেই। তাকে যেভাবে নাচানো হয় সে সেভাবে নাচে।

মারাত্মক। কারণ, কদর নিয়ে আলোচনা আল্লাহ তাআলার কর্ম সম্পর্কে আলোচনার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। আর এটা তো পুরো তাঁর সত্তা ও গুণাবলি বিষয়ে আলোচনা।

দুইটি ভ্রান্ত ফিরকা

এই ধরনের লোকেরা মূলত দুই ভাগে বিভক্ত:

- যারা কিতাব-সুন্নাহতে বর্ণিত অধিকাংশ গুণাবলিকে অস্বীকার করে। যাতে করে সৃষ্টির সাথে স্রষ্টার সাদৃশ্য না হয়। যেমন মুতাজিলা গোষ্ঠী বলে থাকে, 'আল্লাহকে যদি দেখা যায় তবে তো তিনি শারীরিক সত্তা হয়ে গেলেন। কারণ, দেখার জন্য যেকোনো একটা দিক সাব্যস্ত করা লাগবে।' এমনিভাবে তারা আরও বলে, 'যদি আল্লাহর জন্য শ্রবণযোগ্য কথা সাব্যস্ত করা হয় তাহলেও তিনি শারীরিক সত্তা হন।' এ-জাতীয় সাদৃশ্য থেকে বাঁচার জন্য তারা আল্লাহর জন্য 'ইস্তিওয়া' গুণকে সাব্যস্ত করে না। এটা মূলত জাহমিয়া ও মুতাজিলাদের রীতি। যাদের বিদআতী ও গোমরাহ হওয়ার বিষয়ে সালাফগণ ঐকমত্য পোষণ করেছেন। হাদীস ও সুন্নাহর দিকে সম্বন্ধিত পরবর্তীদের অনেকে কিছু কিছু ক্ষেত্রে তাদের অনুসরণ করেছেন।

- যারা এসব গুণাবলিকে আল্লাহর জন্য সাব্যস্ত করতে চেয়েছেন এমন বুদ্ধিজাত প্রমাণের মাধ্যমে, যা কুরআন-সুন্নাহয় বর্ণিত হয়নি। এক্ষেত্রে মুকাতিল ইবনে সুলাইমান[১] ও তার অনুসরণকারী নুহ ইবনে আবী মারয়ামের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। পরবর্তী ও পূর্ববর্তী অনেক মুহাদ্দিস তাদের অনুসরণ করেছেন। অথচ এটা কাররামিয়া গোষ্ঠীর রীতি। তাদের মধ্য থেকে কেউ এই গুণাবলি সাব্যস্ত করার জন্য 'জিসম' বা শরীরকে সাব্যস্ত করেছে। হয়তো প্রত্যক্ষভাবে নয়ত পরোক্ষভাবে।

[১] মুকাতিল ইবনে সুলিমান ছিলেন তাফসীরের বড় একজন ইমাম। কিন্তু তিনি 'মুশাব্বিহা' ফিরকার অন্যতম নেতা ছিলেন। যারা আল্লাহকে সৃষ্টির সাথে তুলনা করত। সে জন্যই অনেকে তার কঠোর সমালোচনা করেছেন। ইমাম আবু ইউসুফ ﷺ বলেছেন, ইমাম আবু হানিফা ﷺ এর কাছে তার কথা বর্ণনা করা হলে তিনি তার বিষয়ে মন্তব্য করেছেন, 'সে বাড়াবাড়ি করেছে। এমনকি আল্লাহকে তাঁর সৃষ্টির মতো সাব্যস্ত করেছে।' (*তাহযিবুল কামাল*, ২৮/৪৪৩) -অনুবাদক

কদর নিয়ে বেশি চিন্তা-ভাবনা নিষেধ হবার কারণ

আবার তাদের মধ্য হতে কেউ আল্লাহ তাআলার জন্য এমন গুণাবলি সাব্যস্ত করেছেন, যে বিষয়ে কুরআন-সুন্নাহয় কোনো কিছু বর্ণিত হয়নি। যেমন: হরকত বা নড়াচড়া ও এ-জাতীয় আরও কিছু গুণ। এগুলো তাদের দৃষ্টিতে আল্লাহর ক্ষেত্রে সাব্যস্ত গুণাবলির জন্য অত্যাবশ্যকীয় বিষয়।

বুদ্ধিজাত প্রমাণের মাধ্যমে মুকাতিল ইবনে সুলাইমানের জাহমিয়াদের বিপক্ষে দলিল পেশ করাকে সালাফগণ অপছন্দ করেছেন এবং তার খুব সমালোচনা করেছেন । অনেকে তো তাকে হত্যা করা বৈধ বলে মত প্রকাশ করেছেন। তাদের মধ্যে ইমাম বুখারী রহ. এর উস্তাদ মাক্কী ইবনে ইবরাহীম রহ. এর নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

মুতাশাবিহাত[১] সম্পর্কে সালাফদের অবস্থান

এই বিষয়ে সবচেয়ে সঠিক সিদ্ধান্ত হলো সালাফে সালেহীনের অনুসৃত পদ্ধতি। তা হলো, সিফাত বা আল্লাহর গুণাবলি ও এ-সংক্রান্ত হাদীসকে কোনো ধরনের ব্যাখ্যা বা অবস্থা ও সাদৃশ্য বর্ণনা করা ছাড়াই যেভাবে বর্ণিত হয়েছে সে অবস্থাথায় রেখে দেওয়া। তাদের কারও থেকে এর বিপরীত কিছু বিশুদ্ধভাবে প্রমাণিত নয়। ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল ﵀ এর ক্ষেত্রে কথাটি বিশেষভাবে প্রযোজ্য।

এমনিভাবে এগুলোর অর্থ নিয়ে বেশি চিন্তা-ভাবনা করা এবং এগুলোর জন্য কোনো দৃষ্টান্ত স্থাপন করা কোনোটাই তাদের থেকে প্রমাণিত নয়। যদিও তাদের কেউ কেউ ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল ﵀ এর যামানার কাছাকাছি। তাদের অনেকে মুকাতিল ইবনে সুলাইমানের অনুসরণে এমনটি করেছেন।

সুতরাং এই বিষয়ে তাদের অনুসরণ করা যাবে না। বরং অনুসরণ করতে হবে ইসলামের মহান ইমামদের। যেমনঃ আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক, মালেক ইবনে আনাস, সুফিয়ান সাওরী, আওযায়ী, মুহাম্মাদ ইবনে ইদরীস শাফেয়ী, আহমদ ইবনে হাম্বল, ইসহাক ইবনে রাহুয়াহ, আবু উবাইদ প্রমুখ ﵏।

এই সমস্ত ইমামদের কারও কথাতেই কালামশাস্ত্রবিদদের আলোচনা পাওয়া যায় না। দার্শনিকদের আলোচনা পাওয়া যাওয়া তো আরও দুরূহ ব্যাপার। আবু যুরআ রাযী ﵀ বলেছেন, 'যাদের কাছে ইলম রয়েছে এবং তারা নিজের ইলমের হেফাজত করতে পারল না, তা প্রচার করার জন্য ইলমে কালামের মুখাপেক্ষী হলো তোমরা তাদের অন্তর্ভুক্ত হোয়ো না।'

[১] মুতাশাবিহ বলা হয় এমন-সব আয়াত ও হাদীসকে, যার অর্থ সাধারণভাবে বোধগম্য হয় না। -অনুবাদক

ফুকাহা ও মুহাদ্দিসদের অনুসৃত নীতির পার্থক্য

এ-জাতীয় নতুন জ্ঞানের মধ্যে আরও আছে, আহলে রায় ফুকাহায়ে কেরামের উদ্ভাবিত বিভিন্ন বুদ্ধিজাত নিয়ম-নীতি ও কায়দা-কানুন। শাখাগত ফিকহী মাসআলাকে সেগুলোর আলোকে রচনা করা হয়ে থাকে। চাই তা সুন্নাহের সাথে মিলুক বা না মিলুক। যদিও সেসব বানানো কায়দা-কানুন কুরআন-সুন্নাহর মূলনীতির আলোকে ব্যাখ্যা করা হয়। কিন্তু সেই ব্যাখ্যাটা অন্যদের ব্যাখ্যার চেয়ে ভিন্ন হয়ে থাকে। এটি হলো সেই বিষয়, যার কারণে অনেক ইমাম হেজাজ ও ইরাকের আহলে রায় ফুকাহায়ে কেরামদের সমালোচনা করেছেন।[১]

[১] এই বিষয়টি আরেকটু সবিস্তারে আলোচনার দাবি রাখে। নয়তো পাঠকমহলের ভুল বোঝার আশঙ্কা রয়েছে। কিছু কিছু মুহাদ্দিসীনে কেরাম ও ফকীহদের হাদীস গ্রহণ-বর্জনের নীতিমালায় ভিন্নতা রয়েছে। সেই ভিন্নতার সূত্র ধরে এই দুই শ্রেণীর মধ্যে দৃষ্টিভঙ্গিগত পার্থক্য রচিত হয়েছে। ফলে এক পক্ষ থেকে অন্য পক্ষের প্রতি অভিযোগের তির ছোড়া হয়েছে। যা সর্বক্ষেত্রে সর্বাংশে যথার্থ নয়।

এই বিষয়টি সবচে সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন বিখ্যাত উসূলে হাদীস বিশারদ আল্লামা তাহের আলজাযায়েরী ﵀ (১৩৩৮ হি.)। প্রথমে তিনি আল্লামা সামআনী ﵀ থেকে একটা মূলনীতি বর্ণনা করেছেন। তা হলো শুধু বিশ্বস্ত ব্যক্তিদের বর্ণনা হলেই তা সহীহ বলে স্বীকৃত হয় না। বরং এর জন্য দরকার গভীর বুঝ, ব্যাপক জানাশোনা ও অধিক হারে শ্রবণ ও আলোচনা-পর্যালোচনা।' এরপর তিনি এই বিষয়টিকে সবিস্তারে লম্বা আলোচনা করেছেন। তাঁর বক্তব্যের প্রয়োজনীয় অংশটি হুবহু তুলে ধরা হলো।

"জেনে রাখুন, এই বিষয়টি (অর্থাৎ কেবল সনদ সহীহ হওয়াটাই কোনো হাদীস আমলযোগ্য হবার জন্য যথেষ্ট নয়) মর্যাদাময় হাদীসশাস্ত্রের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। এই ক্ষেত্রে তিন রকমের দৃষ্টিভঙ্গিসম্পন্ন মানুষ পাওয়া যায়। এক. এমন মানুষেরা, যাদের মূল মনোযোগ থাকে কেবল সনদের দিকে লক্ষ করা। যখন দেখে সনদটি মুত্তাসিল তথা অবিচ্ছিন্ন এবং তার এই অবিচ্ছিন্নতার ক্ষেত্রে কোনোরূপ সন্দেহেরও অবকাশ নেই এবং সনদের বর্ণনাকারীগণও বিশ্বস্ততার বিচারে উত্তীর্ণ তখন তারা হাদীসটিকে সহীহ বলে ঘোষণা দিয়ে দেয়। অন্য বিষয়গুলো গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করে না। ফলে দেখা যায় তারা কোনো একটা হাদীসকে সহীহ বলছে অথচ সেই হাদীসটি অন্য আরেকটি অগ্রগণ্য বর্ণনাকারীদের সূত্রে বর্ণিত হাদীসের বিপরীত। এক্ষেত্রে তারা বলে থাকে, সবগুলোই সহীহ। আবার অনেক সময় বলে, একটা সহীহ অন্যটা অধিক সহীহ। অথচ অধিকাংশ সময়ই দেখা যায় উভয় হাদীসের মধ্যে সমন্বয়সাধন সম্ভবপর হয় না। তো এমন ক্ষেত্রে যখন কেউ সিদ্ধান্ত প্রদান থেকে বিরত থাকে তখন তারা তাকে সুন্নাহবিরোধী বলে আখ্যায়িত করে থাকে। অনেক সময় তাকে বিপদে ফেলতেও কুণ্ঠাবোধ করে না। অথচ এই শাস্ত্রের বিচক্ষণ ব্যক্তিরা সিদ্ধান্ত দিয়েছেন

অপরদিকে মুহাদ্দিস ফুকাহায়ে কেরাম সহীহ হাদীসের অনুসরণ করে থাকেন। যেগুলোর ওপর সাহাবায়ে কেরাম ও তাদের পরবর্তীরা কিংবা তাদের মধ্য হতে এক জামাত আমল করেছেন। যেসব হাদীসের ওপর আমল করাকে সালাফরা ঐকমত্যের ভিত্তিতে পরিত্যাগ করেছেন সেগুলোর ওপর আমল করা জায়েয নয়। কেননা, সেগুলোর ওপর আমল করা যাবে না জানা আছে বিধায় তারা তা পরিত্যাগ করেছেন।[১]

যে, কেবল সনদ সহীহ হওয়া মতন সহীহ হওয়াকে অত্যাবশ্যক করে না। সে জন্যই তারা বলেছেন, শুধু সনদ সহীহ দেখেই কোনো হাদীসকে সহীহ বলে দেওয়া কারও জন্য বৈধ নয় যতক্ষণ না সে এই শাস্ত্রের বিশেষজ্ঞ হবেন। কারণ, আশঙ্কা রয়ে যায় যে, হাদীসটির এমন গোপন ত্রুটি থাকতে পারে যা তার কাছে অজানা। এই জাতীয় মুহাদ্দিসদের বাড়াবাড়ি অনেক সময় এই পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছে যে, (অনেক সময়) তারা অগ্রহণযোগ্য দুর্বল হাদীস গ্রহণ করাকে মানুষের জন্য জরুরি সাব্যস্ত করে। এভাবে তারা মানুষকে বিপদে ফেলে দেয়। এরাই হল মূলত সীমালঙ্ঘনকারী গোষ্ঠী। এদের অধিকাংশই হয়ে থাকে মুহাদ্দিসদের মধ্য হতে। যাদের মধ্যে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি থাকে অনুপস্থিত... (*তাওযীহুন নজর ইলা উসুলিল আসার*, ১/১৯০-৯১, আগ্রহী পাঠক পুরো আলোচনাটা দেখে নিতে পারেন। আমাদের আলোচ্য বিষয়ের সাথে যতটুকু সম্পৃক্ত আমরা শুধু সেটুকুই উদ্ধৃত করলাম।)

তো সনদের বাইরে আরও অন্য জিনিসগুলো গভীরভাবে পর্যবেক্ষণে ফুকাহায়ে কেরামের জামাত বেশি মনোযোগী। তারা কেবল সনদের ওপর নির্ভর করেই কোনো হাদীস আমলযোগ্য হবার ঘোষণা দেন না। ফলে দেখা যায় মুহাদ্দিসদের মধ্য হতে অনেকে তাদের প্রতি সহীহ হাদীসের বিরোধিতা করার অভিযোগ উত্থাপন করে থাকেন। দৃষ্টিভঙ্গিগত এই মতপার্থক্য প্রাচীনকাল থেকেই চলে আসছে। এই বিষয়টি বিস্তারিত আলোচনার দাবি রাখে। যা এখানে করা সম্ভব নয়। আগ্রহীগণ বিস্তারিত জানতে চাইলে পড়ুন: শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলবী ﷺ রচিত হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ, ১/৪৭৮-৫০৩ পৃ.: ড. মুহাম্মাদ আবদুল লতীফ রচিত *তারীখুল ফিকহিল ইসলামী*, ১৭-৫৩ পৃ.; ড. মুস্তফা সাইদ রচিত *দিরাসাতুন তারীখিইয়াতুন লিল ফিকহি ওয়া উসূলিহী*, ৪৯-১০৫ পৃ.

[১] এটাই ছিল সালাফে সালেহীনের রীতি। যেসব হাদীসের ওপর সাহাবা-তাবেয়ীরা আমল করতেন না তারা সেগুলো পরিহার করতেন। এই বিষয়ে কাযী ইয়ায ﷺ তার বিখ্যাত গ্রন্থ *তারতীবুল মাদারিক* এর মধ্যে অনেকগুলো বর্ণনা এনেছেন। সেখান থেকে কিছু উদ্ধৃত করছি।

এক. দ্বিতীয় খলীফা উমর ইবনুল খাত্তাব ﷺ মিম্বরে দাঁড়িয়ে বলেছেন, 'আমি আল্লাহর নামে সে ব্যক্তির ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করছি যে আমলের বিপরীত হাদীস বর্ণনা করে।'

দুই. ইমাম মালেক ﷺ বলেন, অনেক তাবেয়ী আলেম হাদীস বর্ণনা করতেন। সেগুলো অন্যদের থেকেও যখন তাদের কাছে পৌঁছত তখন তারা বলত, 'এগুলো আমাদের অজানা নয়। তবে আমল এর বিপরীত চলে আসছে।' (*তারতীবুল মাদারিক*, ১/৬৬)

উল্লেখ্য, এখানে আমল বলতে খাইরুল কুরুন থেকে প্রজন্মপরম্পরায় চলে আসা আমল বোঝানো হয়েছে। পরবর্তীতে আবিষ্কৃত কোনো আমল নয়। এই বিষয়ে আরও বিস্তারিত জানতে হলে যে গ্রন্থগুলো পড়তে পারেন তা হলো:

১. *তারীখুল মাযাহিবিল ইসলামিইয়া*, ইমাম আবু যুহরা

উমর ইবনে আবদুল আযীয ﵀ বলেছেন,

> তোমাদের পূর্ববর্তীদের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ মত তোমরা গ্রহণ করো। কারণ, তারা তোমাদের চেয়ে বেশি জ্ঞানী।

মদীনাবাসীর আমলের সাথে যদি হাদীস না মেলে তবে ইমাম মালেক ﵀ এর মত হলো, এমন ক্ষেত্রে মদীনাবাসীর আমলকেই গ্রহণ করা হবে। তবে অন্যান্য অধিকাংশ আলেমের মত হলো, এমন ক্ষেত্রেও হাদীসকেই গ্রহণ করা হবে।

---

২. *রিসালাতুল ইমাম লাইস ইবনে সাদ ইলাল ইমাম মালেক*

৩. *আসারুল হাদীসিশ শরীফ*, শায়খ মুহাম্মাদ আওয়ামাহ

৪. অনুবাদকের রচিত '*আলআমালুল মুতাওয়ারাস ওয়া আসারুহু ফি নক্বদিল হাদীস*' (অপ্রকাশিত পাণ্ডুলিপি)

সালাফরা আরও যেসব বিষয় অপছন্দ করেছেন তার মধ্যে আছে, হালাল-হারামের মাসআলা নিয়ে ঝগড়া-বিবাদ ও তর্ক-বিতর্কে লিপ্ত হওয়া। ইসলামের মহান ইমামদের রীতি এমনটা ছিল না। পরবর্তীতে এসবের জন্ম হয়েছে। যেমনঃ শাফেয়ী ও হানাফীদের মাঝে সৃষ্টি হওয়া মতানৈক্যপূর্ণ মাসআলা ও এই বিষয়ে রচিত বিভিন্ন গ্রন্থাবলি ও নানান ধরনের তর্ক-বিতর্ক।

এ সবগুলোই পরবর্তীতে সৃষ্ট, যার কোনো মৌলিক ভিত্তি নেই। এভাবে একটা সময় এসব বিষয় ইলম বলে আখ্যা পেয়েছে এবং মানুষকে এরচেয়ে আরও উপকারী ইলম থেকে বঞ্চিত করেছে। সে জন্যই সালাফে সালেহীন তর্ক-বিতর্কমূলক ইলমকে অপছন্দ করেছেন। হাদীসে এসেছে, রাসূল ﷺ বলেছেন,

مَا ضَلَّ قَوْمٌ بَعْدَ هُدًى كَانُوا عَلَيْهِ إِلَّا
أُوتُوا الْجَدَلَ، ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الْآيَةَ

> তর্ক-বিতর্কে লিপ্ত হবার দরুনই কেবল মানুষ হেদায়াত পাবার পরও আবার গোমরাহ হয়ে যায়।

তারপর তিনি এই আয়াত তেলাওয়াত করেছেন,

مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ

> তারা আপনার সামনে যে উদাহরণই পেশ করে তা কেবল বিতর্কের জন্যই করে। বস্তুত তারা হলো এক বিতর্ককারী সম্প্রদায়।[১]

কোনো এক সালাফ বলেছেন,

> আল্লাহ তাআলা যখন কোনো বান্দার মঙ্গল চান, তখন তার জন্য আমল করার রাস্তা উন্মুক্ত করে দেন এবং বিবাদের দরজাকে বন্ধ করে দেন। আর যখন কোনো বান্দার অকল্যাণ চান, তখন তার আমল করার দরজাকে বন্ধ করে দেন এবং বিবাদের দরজা খুলে দেন।

[১] *সুনানে তিরমিজী*, হাদীস নংঃ ৩২৫৩

ইমাম মালেক ﵀ বলেছেন,

> বর্তমানে মানুষ যে অতিরিক্ত কথনে লিপ্ত, আমি এই অঞ্চলের (মদীনার) মানুষদের তা অপছন্দ করতে দেখেছি।

এই কথার মাধ্যমে তিনি মাসআলা-মাসায়েলের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। তিনি বেশি কথা বলা ও বেশি ফতওয়া দেওয়াকে অপছন্দ করতেন। তিনি বলতেন,

> অনেকে এমনভাবে কথা বলতে থাকে, যেন সে উত্তেজিত উট। এটা এমন ওটা অমন বলতে বলতে কথা চালিয়েই যেতে থাকে।

তিনি অধিক মাসআলার উত্তরপ্রদানকে অপছন্দ করে বলতেন, আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي

> তারা আপনাকে রুহ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। আপনি বলুন,
> রুহ আমার প্রভুর একটি আদেশ।[১]

অর্থাৎ প্রশ্নে জিজ্ঞাসিত বিষয়ে রাসূল ﷺ-এর কাছে কোনো জবাব আসেনি।

একবার ইমাম মালেক ﵀ কে জিজ্ঞাসা করা হলো, 'বিবাদে লিপ্ত হবার জন্য কেউ সুন্নাহর ইলম অর্জন করতে পারবে?'

তিনি উত্তরে বললেন, 'না, বরং সে সঠিক বিষয়টি অবগত করাবে। যদি তার কথা গ্রহণ করা হয় তবে ভালো, অন্যথায় চুপ করে থাকবে।'

ইমাম মালেক ﵀ থেকে এই কথাটিও বর্ণিত আছে যে, 'ইলমী বিষয়ে ঝগড়া-বিবাদ ইলমের নূর ছিনিয়ে নেয়।'

তিনি আরও বলেন, 'ইলমি বিষয়ে বিতর্ক অন্তরকে কঠিন করে দেয় এবং বিদ্বেষের জন্ম দেয়।'

অধিকাংশ জিজ্ঞাসিত মাসআলার বিষয়ে তিনি বলতেন, 'লা আদরি'। মানে হলো আমার জানা নাই।

ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল ﵀ও এই বিষয়ে তাঁর অনুসরণ করতেন। অহেতুক প্রশ্ন ও ঘটনা ঘটার আগেই সেই বিষয়ের মাসআলা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করার বিষয়ে শরীয়তেও নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে। এই বিষয়ে এত

---

[১] সুরা ইসরা, (১৭): ৮৫

বেশি পরিমাণ বর্ণনা পাওয়া যায়, যার উল্লেখ করলে আলোচনা দীর্ঘ হয়ে যাবে।[১]

এ ছাড়া ইমাম মালেক, শাফেয়ী, আহমাদ, ইসহাক রাহিমাহুমুল্লাহর মতো বিখ্যাত আলেম ও সালাফদের বাণীতেও এমন সংক্ষিপ্ত কথার মাধ্যমে ফিকহ ও আহকামের উৎস সম্পর্কে নির্দেশনা প্রদান করার দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। দীর্ঘ বাক্যালাপ ছাড়াই যার উদ্দেশ্য সহজে বুঝে আসে। তাদের কথার মধ্যে সুন্নাহবিরোধী মতের বিপক্ষে অত্যন্ত সূক্ষ্ম ইঙ্গিত ও চমৎকার প্রকাশভঙ্গির মাধ্যমে প্রমাণ করা এমন সব প্রতি-উত্তর পাওয়া যায়, যা তাদের পরবর্তী কালামশাস্ত্রবিদদের লম্বা আলোচনার প্রয়োজনীয়তাকে ক্ষীণ করে দেয়। বরং অনেক সময় সালাফদের সংক্ষিপ্ত ও অল্প কথা যে সঠিক সিদ্ধান্ত ধারণ করে, পরবর্তীদের দীর্ঘ ও লম্বা আলোচনা তা ধারণ করতে সক্ষম হয় না।

---

[১] ঘটনা ঘটার আগেই তার সমাধান নিয়ে চিন্তা-ভাবনা ও গবেষণা করার বিষয়টি পছন্দযোগ্য কি না, সে বিষয়ে উলামায়ে কেরামের মধ্যে দৃষ্টিভঙ্গিগত পার্থক্য রয়েছে। অনেকে এটাকে অপছন্দ করতেন। এদের বেশির ভাগই ছিলেন হিজাযকেন্দ্রিক উলামায়ে কেরাম। আর যারা একে পছন্দ করতেন ও এর চর্চা করতেন তারা হলেন ইরাককেন্দ্রিক উলামায়ে কেরাম। এই দৃষ্টিভঙ্গিগত পার্থক্য রচিত হবার পেছনে দুই অঞ্চলের পরিবেশগত ভিন্নতা ছিল অন্যতম কারণ। কিতাবাদিতে এটিও *আলফিকহুত তাকদিরি* নামেই সমধিক প্রসিদ্ধ।

তবে এই বিষয়ে ইনসাফপূর্ণ বক্তব্য হচ্ছে, প্রয়োজনের খাতিরে এটি পছন্দনীয়। কারণ, এর দ্বারা আগে থেকেই ঘটিতব্য সমস্যার সমাধান জানা থাকে। ফলে ঘটনা ঘটার পর সাথে সাথেই তার সমাধান পাওয়া সম্ভব হয়। পেরেশান হতে হয় না।

খতীব বাগদাদী ﵀ বলেছেন, 'উমর ইবনুল খাত্তাব, আলী ইবনে আবী তালেব প্রমুখ সাহাবীদের থেকে পাওয়া যায় যে, তারা ঘটনা ঘটার আগেই তার হুকুম সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। ইলমুল ফারায়েয ও উত্তরাধিকার বণ্টন বিষয়ে পর্যালোচনা করেছেন। তাবেয়ীগণ ও তাদের পরে আগমনকারী বিভিন্ন শহরের ফুকাহায়ে কেরামও তাদের রীতি অনুসরণ করেছেন। ফলে এটা তাদের থেকে একরকমের ঐকমত্যই বলা যায় যে এটি জায়েয, অপছন্দনীয় কিছু নয়। বৈধ, নিষিদ্ধ কিছু নয়। (*আলফকীহ ওয়াল মুতাফাক্কিহ*: ২/১১; অধ্যায়: ঘটনা ঘটার আগেই তার হুকুম সম্পর্কে প্রশ্ন করা এবং এই বিষয়ে আলোচনা করা)

আর যেসব বর্ণনাতে এই বিষয়ে অপছন্দনীয়তার কথা পাওয়া যায় সে বিষয়ে খতীব বাগদাদী ﵀ বলেন, 'আর উমর ﵁ কর্তৃক অঘটিত বিষয়ে কোনো কিছু জিজ্ঞাসা করা এবং জিজ্ঞাসাকারীকে অভিসম্পাত করার কারণ হতে পারে, তিনি এমন জিজ্ঞাসার ক্ষেত্রে এমনটি করেছেন, যেটা হঠকারিতা ও অন্যকে ভুল সাব্যস্ত করার উদ্দেশ্যে করা হয়। মাসআলা সম্পর্কে গভীর জ্ঞানার্জন এবং উপকার লাভ করার উদ্দেশ্যে নয়।' এই বিষয়ে আরও বিস্তারিত জানতে হলে পড়তে পারেন আবদুল ফাত্তাহ আবু গুদ্দাহ ﵀ রচিত *মানহাজুস সালাফ ফিস সুওয়ালি আনিল ইলম*। এই একটি গ্রন্থই এই বিষয়ে পুরোপুরি স্পষ্ট ধারণা দিতে সক্ষম হবে ইনশাআল্লাহ।

সালাফরা কেন কম কথা বলতেন

অজ্ঞতা ও অপারগতার কারণে এই উম্মতের মহান পূর্বসূরিরা তর্ক-বিতর্ক ও বিবাদ থেকে বিরত থাকতেন, এমনটা কখনোই নয়; বরং তারা আল্লাহর ভয় ও ইলমের খাতিরেই চুপ থাকতেন। আর তাদের পরবর্তীদের বেশি কথা বলা এই জন্য নয়, তাদের এমন কোনো বিশেষ ইলম অর্জিত ছিল, যা তাদের পূর্বযুগের মনীষীদের কাছে ছিল না। যার ফলে তারা বেশি কথা বলতেন। বরং পরহেজগারির কমতির কারণেই তারা বেশি কথা বলতে ভালোবাসতেন। যেমন বিখ্যাত তাবেয়ী হাসান বসরী ﵀ কিছু লোককে বিতর্ক করতে দেখে বললেন, 'এরা এমন লোক, ইবাদাতের প্রতি যাদের বিরক্তি সৃষ্টি হয়েছে। কথা বলা তাদের জন্য অনেক সহজ কাজ। তাই তারা এত বেশি কথা বলছে।'

অন্য বর্ণনায় আছে, 'বিতর্কের বিষয়ে আমি তোমার চেয়ে বেশি ইলম রাখি। কিন্তু আমি তোমার সাথে বিতর্ক করব না।'

ইবরাহীম নাখয়ী ﵀ বলেন, 'আমি কখনো বিতর্কে জড়াইনি।'

আব্দুল কারীম জাযারী ﵀ বলেন, 'পরহেজগার ও আল্লাহওয়ালা ব্যক্তি কখনো বিতর্কে লিপ্ত হয় না।'[১]

জাফর ইবনে মুহাম্মাদ ﵀ বলেছেন, 'দ্বীনি বিষয়ে বিতর্কে লিপ্ত হওয়া থেকে সাবধান থাকো। কেননা, এটি অন্তরকে ব্যতিব্যস্ত করে রাখে এবং কপটতা সৃষ্টি করে।'[২]

উমর ইবনে আব্দুল আযীয ﵀ বলতেন, 'যখন তুমি ঝগড়া-বিবাদ শুনতে পাবে, তখন নিবৃত্ত থাকো।'

তিনি আরও বলেন, 'যে ব্যক্তির দ্বীন শেখার উদ্দেশ্য হবে বিবাদ করা, তার ব্যস্ততা বেড়ে যাবে।'

---

[১] আল্লামা আজুরী, *শরীয়ত*, পৃষ্ঠা: ৫৮

[২] *হিলইয়াতুল আওলিয়া:* ৩/১৯৮

অন্যত্র তিনি বলেন, 'নিশ্চয় পূর্ববর্তী মনীষীরা অনেক ইলম রাখতেন। বিচক্ষণতার কারণে তারা চুপ থাকতেন। যদি তারা বিতর্ক করতে চাইতেন তবে তাদের সেই সাধ্য অনেক বেশি ছিল।'[১]

এই বিষয়ে সালাফদের থেকে আরও অনেক উক্তি পাওয়া যায়।

পরবর্তী অনেক লোকেরা এমনটা ধারণা করে ধোঁকা খেয়েছে যে, দ্বীনি মাসায়েলের ক্ষেত্রে অধিক তর্ক-বিতর্ক ও আলোচনাকারী ব্যক্তি তার তুলনায় বেশি ইলমের অধিকারী, যিনি এমনটি নন। এটা কেবলই মূর্খতা। আপনি আবু বকর, উমর, মুয়াজ ইবনে জাবাল, আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ, জায়েদ ইবনে সাবেত রাদিয়াল্লাহু আনহুমের মতো প্রবীণ সাহাবীদের দিকে লক্ষ করে দেখুন তারা কেমন ছিলেন। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস ﵄ এর তুলনায় তাদের কথার পরিমাণ অনেক কম। অথচ নিঃসন্দেহে তারা সকলেই তাঁর তুলনায় বেশি ইলমের অধিকারী ছিলেন। এমনিভাবে সাহাবীদের তুলনায় তাবেয়ীদের কথার পরিমাণ বেশি। অথচ সাহাবীরা তাদের তুলনায় অধিক জ্ঞানী ছিলেন। এমনিভাবে তাবে-তাবেয়ীদের কথার পরিমাণ তাবেয়ীদের তুলনায় অনেক বেশি। অথচ তাবেয়ীরা তাদের তুলনায় অধিক জ্ঞানী ছিলেন। সুতরাং বোঝা গেল, ইলমের আধিক্য বেশি কথা বলতে পারা বা বেশি রেওয়ায়েত করতে পারা দিয়ে নির্ণীত হয় না। বরং এটি হলো অন্তরে স্থাপিত এক ধরনের নূর, যা দ্বারা বান্দা সত্য ও সঠিক বিষয় চিনতে পারে এবং এর মাধ্যমে সঠিক-বেঠিকের মধ্যকার পার্থক্য করে তাকে এমন সংক্ষিপ্ত ভাষায় প্রকাশ করতে পারে, যার দ্বারা লক্ষ্য-উদ্দেশ্য অর্জনে সে পুরোপুরি সক্ষম হয়।

রাসূল ﷺকে অল্প কথায় অধিক মর্ম প্রকাশের ক্ষমতা দেওয়া হয়েছিল। তাঁর জন্য কথাকে সংক্ষিপ্ত করে দেওয়া হয়েছিল। সে জন্যই বেশি কথা বলা ও প্রশ্নোত্তর করার বিষয়ে শরীয়তে নিষেধাজ্ঞা এসেছে।

রাসূল ﷺ বলেছেন,

إِنَّ اللهَ لَمْ يَبْعَثْ نَبِيًّا إِلَّا مُبَلِّغًا، وَإِنَّ
تَشْقِيقَ الْكَلَامِ مِنَ الشَّيْطَانِ

> নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা বাগ্মী করেই নবীদের প্রেরণ করেন। আর সাজিয়ে সাজিয়ে কথা বলা শয়তানের কাজ।[২]

---

[১] *হিলইয়াতুল আওলিয়া: ৫/৩২৫*

[২] *মুসান্নাফে আব্দুর রাজ্জাক: ১১/১৬৩*

রাসূল ﷺ-এর খুতবাগুলো তো মধ্যম মানের। তিনি এমনভাবে কথা বলতেন, যদি কেউ তা গণনা করতে চাইত তবে গণনা করতে পারত।

তিনি বলেছেন,

إِنَّ مِنَ الْبَيَانِ سِحْرًا

> নিশ্চয় কথার মধ্যে জাদু আছে।[১]

তিনি হাদীসটি নিন্দার্থে বলেছেন, প্রশংসার্থে নয়। অথচ অনেকে এমনটিই ধারণা করেছে। যে হাদীসটির পূর্বাপর গভীরভাবে খেয়াল করবে, সে নিশ্চিতভাবে তা বুঝতে পারবে।

আবদুল্লাহ ইবনে উমর ﷺ থেকে সুনানে তিরমিজীসহ অন্যান্য হাদীসের কিতাবে মারফু হিসাবে একটি হাদীস উল্লেখ হয়েছে। তা হলো,

إِنَّ اللهَ لَيُبْغِضُ الْبَلِيغَ مِنَ الرِّجَالِ، الَّذِي يَتَخَلَّلُ بِلِسَانِهِ تَخَلُّلَ الْبَقَرَةِ

> আল্লাহ তাআলা সেসব লোককে ঘৃণা করেন, যারা বাক্‌পটুত্ব প্রদর্শনের জন্য জিহ্বাকে দাঁতের সঙ্গে লাগিয়ে বিকট শব্দ করে, যেভাবে গরু তার জিহ্বা নেড়ে করে থাকে।[২]

এই অর্থে আরও অনেক মারফু হাদীস রয়েছে। উমর, সাআদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস, আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ, আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহুম প্রমুখ সাহাবীদের থেকেও এই বিষয়ে মারফু হাদীস পাওয়া যায়। সুতরাং এই বিশ্বাস রাখা জরুরি যে, যারা ইলমী বিষয়ে বেশি কথা বলে ও দীর্ঘ আলোচনা করে তারা কখনই অল্প কথায় অভ্যস্ত পুর্ববর্তী মনীষীদের তুলনায় অধিক ইলমের অধিকারী নন।

একটি ভ্রান্ত ধারণা

অনেক সময় আমরা মূর্খ লোকদের কথায় ধোঁকা খেয়ে যাই। তারা বিশ্বাস করে, পরবর্তীকালে যারা অধিকহারে কথা বলে গিয়েছেন তারা প্রাচীন যুগের সালাফদের চেয়ে বেশি ইলমের অধিকারী ছিলেন। তাদের অনেকে তো এমন

---

[১] *সহীহুল বুখারী*: ৫১৪৬

[২] *তিরমিজী*, হাদীস নং: ২৮৫৩; *আবু দাউদ*, হাদীস নং: ৫০০৫

ধারণাও করে যে, সে সাহাবা ও তাবেয়ীদের থেকেও বেশি ইলমের অধিকারী। কারণ, সে বেশি বয়ান করতে পারে ও কথা বলতে পারে। আবার কেউ কেউ বলে, সে অনুসরণীয় ইমামদের থেকেও বেশি ইলমসম্পন্ন। এটি সে মুখে না বললেও তার অবস্থান থেকে তা প্রতিভাত হয়। কারণ, অনুসরণীয় ফকীহ ইমামগণ তাঁদের পূর্ববর্তী আলেমদের তুলনায় বেশি কথা বলেছেন। সুতরাং তাঁদের পরে আগমনকারী ব্যক্তিরা যদি অতিকথনে সেসব ফকীহদের ছাড়িয়ে যাবার দরুন তাঁদের চেয়ে বেশি ইলমের অধিকারী বলে গণ্য হন, তাহলে তো নিশ্চিত করে বলা যায় যে, তারা সেসব সাহাবা ও তাবেয়ীদের থেকেও বেশি জ্ঞানী হবেন, যাদের কথার পরিমাণ ফকীহ ইমামদের থেকেও কম ছিল। যেমন: সুফিয়ান সাওরী, আওযায়ী, লাইস ইবনে সাআদ, আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক রাহিমাহুমুল্লাহ সহ তাঁদের সমপর্যায়ের অন্যান্য আলেমগণ এবং তাঁদের পূর্ববর্তী সাহাবা ও তাবেয়ীগণ। এদের প্রত্যেকেই তাঁদের পূর্বের লোকদের তুলনায় স্বল্পভাষী ছিলেন। এটা মূলত সালাফে সালেহীনের মর্যাদাকে খাটো করা। তাঁদের প্রতি মানুষের মনে মন্দ ধারণা সৃষ্টি করা। তাদের অজ্ঞ ও অল্প ইলমের অধিকারী সাব্যস্ত করা। লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ!

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ ﷺ সাহাবীদের বিষয়ে সত্যই বলেছেন যে, 'উম্মাহর মধ্যে তারা সবচেয়ে স্বচ্ছ মনের বাহক, সবচে গভীর জ্ঞানের ধারক এবং সবচে কম লৌকিকতা প্রদর্শনকারী।'[১] আবদুল্লাহ ইবনে উমর ﷺ থেকেও অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। এই কথার মধ্যে ইঙ্গিত রয়েছে যে, সাহাবায়ে কেরামের পরবর্তী লোকেরা তাদের তুলনায় কম ইলমের অধিকারী ও বেশি লৌকিকতা প্রদর্শনকারী।

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ ﷺ আরও বলেছেন,

> তোমরা এমন একটা যামানায় আছো, যেখানে আলেমদের সংখ্যা বেশি, বক্তাদের সংখ্যা কম। অচিরেই তোমাদের পর এমন এক যামানা আসবে যখন আলেমদের সংখ্যা কম এবং বক্তাদের সংখ্যা বেশি হবে।[২]

সুতরাং যার ইলম-জ্ঞান বৃদ্ধি পায় এবং কথা বলার পরিমাণ কমে যায় তিনি প্রশংসিত। আর যার অবস্থা এর বিপরীত হয় সে নিন্দিত। রাসূল ﷺ ইয়েমেনবাসীদের জন্য ঈমান ও ফিকহের দুয়া করেছেন। আর ইয়েমেনের

---

[১] *জামিউ বয়ানিল ইলম*: ২/৯৭

[২] *আল-ইলম*, আবি খায়সামা, পৃষ্ঠা: ১০৯

অধিবাসীরা স্বল্পভাষী ও অধিক ইলমের অধিকারী। কিন্তু তাদের ইলম হলো উপকারী ইলম, যার অবস্থানস্থল হলো অন্তর। তারা জবানে কেবল ততটুকুই প্রকাশ করে যতটুকুর প্রয়োজন দেখা দেয়। এটাই হলো প্রকৃত ইলম ও ফিকহ।

উত্তম ইলমের বর্ণনা

সবচেয়ে উত্তম ইলম হলো কুরআনের তাফসীর ও হাদীসের ইলম। এবং হারাম-হালাল বিষয়ক সেই ইলম, যা সাহাবায়ে কেরাম, তাবেয়ী, তাবে-তাবেয়ী ও অনুসরণীয় ইমামদের থেকে বর্ণিত হয়েছে। সুতরাং তাদের থেকে প্রাপ্ত সেসব ইলম জেনেবুঝে আয়ত্ত করা ও সেগুলোর ফিকহ অর্জন করা হলো সবচেয়ে উত্তম। তাদের পরে নতুন করে যেসব ইলমের উদ্ভব হয়েছে সেগুলো অধিকহারে অর্জন করার মধ্যে তেমন কোনো মঙ্গল নেই। তবে যদি তা সালাফদের কথা বোঝার জন্য সহায়ক হয় তবে ভিন্ন কথা।

আর যেসব বিষয় তাদের কথার বিপরীত, তার অধিকাংশই ভ্রান্ত অথবা সেগুলোতে তেমন কোনো উপকার নেই। বরং তাদের কথার মধ্যেই আমাদের জন্য পর্যাপ্ত ও যথেষ্ট খোরাক রয়েছে। সেজন্যই দেখা যায়, পরবর্তীদের কথাতে যেসব তথ্য পাওয়া যায় সেগুলো সালাফদের কথাতে খুবই সংক্ষিপ্ত বাক্যে বিদ্যমান থাকে। এমনিভাবে পরবর্তীদের কথা-বার্তাতে যেসব ভ্রান্ত বিষয়ের উপস্থিতি রয়েছে সূক্ষ্মভাবে লক্ষ করলে সালাফদের কথাতে সেগুলোর প্রতি ইঙ্গিত পাওয়া যায়। তাদের কথাতে এমন এমন চমৎকার ও সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিষয় পাওয়া যায়, পরবর্তীদের কথাতে যার লেশমাত্র থাকে না। সুতরাং যে তাদের কথা থেকে ইলম নেবে না, সে এই কল্যাণ থেকে বঞ্চিত হবে। এর সাথে সে পরবর্তী লোকদের পতিত হওয়া গোমরাহিতেও নিপতিত হবে।

যে ব্যক্তি তাদের কথাগুলো সংকলন করতে আগ্রহী তার জন্য কর্তব্য হলো অশুদ্ধ বর্ণনাকে বিশুদ্ধ বর্ণনা থেকে পৃথক করে নেওয়া। আর এটা জরাহ-তাদীল ও ইলালের জ্ঞান অর্জন করার মাধ্যমে জানা সম্ভব।[১] যে ব্যক্তির এই বিষয়ে জ্ঞান নেই সে এসব বর্ণনা করার ক্ষেত্রে নির্ভরযোগ্য বলে বিবেচিত হবে না। বরং সত্য-মিথ্যা সব তার কাছে মিশ্রিত হয়ে যাবে। ফলে তার কাছে থাকা ইলমও অনির্ভরযোগ্য বলে বিবেচিত হবে। যেমন আমরা দেখে থাকি যে, জরাহ-তাদীল ও ইলাল সম্পর্কে যার জানাশোনার পরিধি একেবারেই কম সে নবী ﷺ ও সালাফদের থেকে যা বর্ণনা করে তার ওপর

---

[১] ইলমুল জরাহ-তাদীল বলা হয় বর্ণনাকারীদের বিষয়ে বর্ণিত ভালোমন্দ মন্তব্যসমূহ জানার শাস্ত্রকে। আর ইলাল দ্বারা উদ্দেশ্যে হলো বর্ণনাকারীদের ভুলের কারণে হাদীসের সনদ বা মতনের মধ্যে সৃষ্টি হওয়া গোপন ত্রুটি। যার কারণে হাদীস দুর্বল হয়ে যায়।

আস্থা রাখা যায় না। কারণ, শুদ্ধ-অশুদ্ধ বর্ণনা বিষয়ে তার জ্ঞান না থাকার ফলে এমনও হতে পারে যে, তার বর্ণনা করা সকল বক্তব্যই বাতিলের খাতায় অন্তর্ভুক্ত।

ইমাম আওযায়ী ﷺ বলেছেন, 'প্রকৃত ইলম সেটাই যা সাহাবায়ে কেরাম প্রদান করেছেন। এর বাইরে যা আছে সেটা মূলত ইলম নয়।'[১]

ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল ﷺ তাবেয়ীদের বিষয়ে বলেছেন, 'তাদের কথা লিখে রাখা বা পরিত্যাগ করার ব্যাপারে তুমি স্বাধীন।'

ইবনে শিহাব যুহরী ﷺ তাবেয়ীদের কথা লিখে রাখতেন। কিন্তু সালেহ ইবনে কায়সান ﷺ লিখতেন না। পরবর্তী সময় তিনি এর জন্য লজ্জা বোধ করতেন।[২]

[১] *জামিউ বয়ানিল ইলম:* ২/২৯

[২] *তাকয়ীদুল ইলম*, পৃষ্ঠা: ১০৬

নব আবিষ্কৃত ইলম সম্পর্কে সতর্কতা

সালাফদের পরে যে ইলমের উদ্ভব ঘটেছে সে সম্পর্কে সতর্ক থাকা উচিত। কারণ, তাদের পরে অনেক নতুন জিনিসের জন্ম হয়েছে। হাদীস-সুন্নাহের অনুসরণের দিকে সম্বন্ধিত আহলে জাহের গোষ্ঠীই হাদীস-সুন্নাহের সবচেয়ে বেশি বিপরীত কাজ করে থাকে। কারণ, তারা ইমামদের থেকে বিচ্ছিন্ন এবং সবকিছু নিজেদের বুঝমতো বোঝার কারণে তাদের থেকে আলাদা। উপরন্তু তারা তাদের পূর্ববর্তী ইমামরা যেসব বিষয় গ্রহণ করেননি সেগুলোও অনেক সময় গ্রহণ করে থাকে।

তবে এর সাথে দার্শনিক বা মুতাকাল্লিমিনদের আলোচনায় প্রবিষ্ট হওয়া কেবলই অকল্যাণ। যারা এতে লিপ্ত হয় তারা খুব অল্পই এদের আবর্জনা থেকে নিজেকে রক্ষা করতে পারে। যেমন ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল ﷺ বলেছেন, 'যে কালামশাস্ত্র চর্চা করে সে একসময় জাহমিয়া হয়ে যায়।'

ইমাম আহমাদ ﷺ ও অন্যান্য সালাফরা কালামশাস্ত্রবিদদের থেকে সতর্ক করতেন। যদিও তারা সুন্নাহের স্বপক্ষে কাজ করে থাকে। কালামশাস্ত্র পছন্দকারীদের কথার মধ্যে তর্ক-বিতর্কের গভীরে যেতে অনাগ্রহী ব্যক্তিদের প্রতি যেসব নিন্দাবাদ দেখতে পাওয়া যায় এবং তাদের অজ্ঞ আখ্যা দেওয়ার যে প্রচেষ্টা পরিলক্ষিত হয় বা তাদের 'হাশাবী'[১] বলে সম্বোধন করার প্রবণতা দৃষ্টিগোচর হয় অথবা বলা হয় যে, তারা আল্লাহর পরিচয় জানে না ও তার দ্বীন সম্পর্কে তেমন জ্ঞানী নয়, তো এ সবকিছুই হলো মূলত শয়তানের কাজ। এর থেকে আমরা আল্লাহ তাআলার আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

পরবর্তী যুগে আবিষ্কার হওয়া জ্ঞানের মধ্যে আরও রয়েছে কেবল নিজস্ব মত, অভিরুচি ও কাশফের ভিত্তিতে মারেফত এবং আধ্যাত্মিক-কর্ম ইত্যাদি বাতিনী ইলমের আলোচনায় লিপ্ত হওয়া। এটি অত্যন্ত মারাত্মক ও ঝুঁকিপূর্ণ। ইমাম আহমাদ ﷺ এর মতো মনীষী ইমামগণ একে খুবই অপছন্দ করেছেন।

আবু সুলাইমান ﷺ বলতেন,

[১] হাশাবী হলো একটা ভ্রান্ত ফিরকার নাম। যারা দেহবাদী আকীদায় বিশ্বাসী এবং আল্লাহ তাআলার জন্য বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সাব্যস্ত করে থাকে। এদের মুজাসসিমাও বলা হয়।

> মানুষদের অনেক সূক্ষ্ম জ্ঞান-গবেষণা আমি পেয়েছি। সেগুলোর কোনোটিই কুরআন-সুন্নাহের মতো ন্যায়পরায়ণ দুই সাক্ষীর মাধ্যমে যাচাই করা ছাড়া আমি গ্রহণ করিনি।[১]

জুনাইদ ﷺ বলেছেন,

> আমাদের ইলম কুরআন-সুন্নাহের মাধ্যমে গণ্ডিবদ্ধ। যে ব্যক্তি কুরআন না পড়ে শুধু হাদীস লিপিবদ্ধ করে, আমাদের এই ইলম-জগতে তার অনুসরণ করা হয় না।[২]

এই অঙ্গনটি অনেক বিস্তৃত। অনেকে এর কারণে নিফাক ও ধর্মদ্রোহিতার সীমানা পর্যন্ত পৌঁছে গেছে। অনেকে এই দাবিও করে বসেছে যে, ওলি-আওলিয়ারা নবীদের থেকেও বেশি সম্মানী। অথবা তারা নবীদের থেকে অমুখাপেক্ষী। এমনকি নবীরা যে শরীয়ত নিয়ে প্রেরিত হয়েছেন অনেক ক্ষেত্রে তারা একে অবহেলা করেছে। সৃষ্টি ও স্রষ্টা এক হবার কুফুরীতত্ত্বের অবতারণা করেছে। নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা ও শরীয়তের অবৈধ জিনিসকে বৈধ হবার দাবি করেছে। এভাবে তারা দ্বীনের ভেতর এমন অনেক কিছু প্রবেশ করিয়েছে, যার সাথে শরীয়তের কোনো সম্পর্ক নেই।

তাদের কেউ কেউ ধারণা করেছে যে, মানুষের অন্তর বিগলিত হবার জন্য গান-বাজনা ও নৃত্য করা যাবে। আবার কেউ ধারণা করেছে, মনোজাগতিক চর্চার উদ্দেশ্যে হারাম দৃশ্য ও তার প্রতি দৃষ্টিপাত করা যাবে। অন্য অনেকে ধারণা করেছে বিনয় অর্জন ও আত্মম্ভরিতা বর্জনের উপায় হলো ছেঁড়া-ফাটা কাপড় পরিধান করা। অথচ এসব বিষয়কে শরীয়ত অনুমোদন করে না। কারণ, এগুলো আল্লাহর স্মরণ ও সালাতের পথে প্রতিবন্ধক হয় এবং দ্বীনকে তামাশার বস্তুতে রূপান্তরিত করে।

সুতরাং উপকারী ইলম হলো কুরআন-সুন্নাহের নুসুসকে আয়ত্ত করা। সেগুলোর অর্থ অনুধাবন করা। কুরআন-হাদীসের অর্থ বোঝা, হারাম-হালালের মাসআলা নিয়ে আলোচনা করা এবং আধ্যাত্মিকতা ও মারেফতের ক্ষেত্রে সাহাবায়ে কেরাম ও তাবেয়ী, তাবে-তাবেয়ীদের থেকে বর্ণিত বিষয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকা। প্রথমেই বিশুদ্ধ বিষয়কে অশুদ্ধ বিষয় থেকে পৃথক করে তারপর তার অর্থ বোঝার বিষয়ে সচেষ্ট থাকা। এর মধ্যেই জ্ঞানীদের জন্য যথেষ্ট খোরাক রয়েছে এবং যারা উপকারী ইলম নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে চায় তাদের জন্য যাবতীয় কল্যাণকর উপাদান রয়েছে।

---

[১] *তাবাকাতুস সুফিয়্যা*, পৃষ্ঠা: ৭৮

[২] *হিলইয়াতুল আওলিয়া:* ১০/২৫৫

ইলমের ফলাফল

যে ব্যক্তি এসব বিষয়ে অবগত হয়ে স্বীয় উদ্দেশ্যকে আল্লাহর জন্য পরিশুদ্ধ করল এবং এই বিষয়ে তার কাছে সাহায্য প্রার্থনা করল, তো অবশ্যই তিনি তাকে সাহায্য করবেন, সঠিক পথ প্রদর্শন করবেন, তাওফীক দান করবেন এবং দ্বীনের বিশুদ্ধ বুঝ প্রদান করবেন। এরপরই এই ইলম কাঙ্ক্ষিত ফলাফল প্রদান করবেড়আর তা হলো আল্লাহকে ভয় করা। যেমন আল্লাহ তাআলা কুরআনুল কারীমে ইরশাদ করেছেন,

إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ

> আল্লাহর বান্দাদের মধ্য হতে কেবল আলেমরাই তাকে (সত্যিকারের) ভয় করে।[১]

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ ﷺ বলেছেন,

> আল্লাহকে ভয় পাওয়ার জন্য ইলমই যথে। আর তাঁর বিষয়ে ধোঁকায় পতিত হওয়ার জন্য অজ্ঞতাই যথে।[২]

কোনো এক সালাফ বলেছেন, 'অধিক বিষয় বর্ণনা করা প্রকৃত ইলম নয়। বরং প্রকৃত ইলম হচ্ছে আল্লাহকে ভয় করা।'

অন্য আরেকজন বলেছেন, 'যে আল্লাহকে ভয় করে সে প্রকৃত আলেম। আর যে তাঁর অবাধ্যতা করে সে প্রকৃত জাহেল।' এই বিষয়ে তাদের থেকে আরও বহু বক্তব্য পাওয়া যায়।

এর কারণ হলো, উপকারী ইলম দুইটা জিনিসকে নির্দেশ করে।

- প্রথম হলো: আল্লাহর পরিচয়, তার উপযুক্ত সুন্দর নামসমূহ ও উচ্চতর গুণসমূহ এবং চমৎকার কর্মসমূহ। এটি তাঁর বড়ত্ব-মহত্ত্ব, ভয়-প্রতিপত্তি, ভালোবাসা-আকাঙ্ক্ষা, তাঁর ওপর ভরসা ও তাঁর সিদ্ধান্তের প্রতি সন্তুষ্ট থাকা এবং বিপদাপদে সবর করাকে আবশ্যক করে।

[১] সূরা ফাতির, (৩৫): ২৮

[২] *কিতাবুয যুহদ*, আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক, পৃষ্ঠা: ১৫

৩. দ্বিতীয় হলো: আকীদা-বিশ্বাস ও প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য কথাকাজের ক্ষেত্রে তাঁর পছন্দ ও অপছন্দের বিষয়ে অবগত হওয়া। যে এসব বিষয় জানবে তার জন্য আল্লাহর সন্তুষ্টিপূর্ণ কাজে দ্রুত অগ্রসর হওয়া এবং তাঁর অসন্তুষ্টি ও অপছন্দের কাজ থেকে দূরে সরে থাকা জরুরি হয়ে পড়বে। যখন ইলম তার বাহকের জন্য এমন ফলাফল বয়ে আনবে তখন তাকে বলা হবে উপকারী ইলম। আর ইলম যখন উপকারী হবে এবং আল্লাহর বড়ত্ব তার অন্তরে গেঁথে যাবে তখন অন্তর এমনিতেই বিনয়াবনত হবে। প্রতিপত্তি, বড়ত্ব-মহত্ত্ব ও ভয়-ভালোবাসার দরুন আল্লাহর সামনে মাথানত করবে। আর যখন আল্লাহর সামনে অন্তর মাথানত করবে এবং তার জন্য বিনয়ের বশে ঝুঁকে পড়বে তখন দুনিয়ার সামান্য হালাল জিনিস দ্বারাই সে পরিতৃপ্ত হবে। অল্পে তুষ্টি ও দুনিয়া-বিমুখতা তার অবশ্যই লাভ হবে।

ধন-সম্পদ, পদ-পদবি, বিলাসী জীবনযাপন এগুলোর কারণে আল্লাহ তাআলা আখেরাতে বান্দার নেয়ামতের অংশ কমিয়ে দেন। যদিও সে আল্লাহর কাছে সম্মানিত হয়। যেমন আবদুল্লাহ ইবনে উমর ﵄ সহ অন্যান্য সালাফরা তা বলেছেন এবং এই বিষয়ে রাসূল ﷺ থেকেও বর্ণনা পাওয়া যায়। মূলত এসব প্রত্যেক ধ্বংসশীল বস্তুই অস্থায়ী।

এমন অবস্থায় উপনীত হলে বান্দা ও আল্লাহর মাঝে একটি বিশেষ পরিচয় ও মান-মর্যাদার বন্ধন রচিত হয়। ফলে তখন বান্দা যদি কিছু চায় আল্লাহ তাআলা তা দান করেন। যদি সে তাকে ডাকে তবে তার ডাকে তিনি সাড়া দেন। যেমন হাদীসে কুদসীতে বলা হয়েছে,

مَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ،
فَأَكُونَ أَنَا سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ،
وَلِسَانَهُ الَّذِي يَنْطِقُ بِهِ، وَقَلْبَهُ الَّذِي يَعْقِلُ بِهِ، فَإِذَا دَعَا
أَجَبْتُهُ، وَإِذَا سَأَلَنِي أَعْطَيْتُهُ، وَإِذَا اسْتَنْصَرَنِي نَصَرْتُهُ

> বান্দা নফল ইবাদাতের মাধ্যমে আমার নৈকট্য লাভ করতে থাকে। এমনকি একসময় আমি তাকে ভালোবেসে ফেলি। যখন তাকে ভালোবেসে ফেলি তখন আমি তার কান হয়ে যাই, যা দ্বারা সে শ্রবণ

> করে। তার চোখ হয়ে যাই, যা দ্বারা সে দেখে। তার হাত হয়ে যাই, যা দ্বারা সে ধরে। তার পা হয়ে যাই, যা দ্বারা সে হাঁটে। যদি সে আমার কাছে চায় তবে অবশ্যই তাকে দান করি। আর যদি আমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করে তবে তাকে আশ্রয় দিই।[১] অন্য বর্ণনায় আছে, যদি আমাকে ডাকে আমি সাড়া দিই।[২]

আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস ﵄ কে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে অসিয়্যাত করেছেন তাতে আছে,

احْفَظِ اللّٰهَ يَحْفَظْكَ، احْفَظِ اللّٰهَ تَجِدْهُ أَمَامَكَ،
تَعَرَّفْ إِلَيْهِ فِي الرَّخَاءِ، يَعْرِفْكَ فِي الشِّدَّةِ

> আল্লাহকে হেফাজত করো। তিনিও তোমায় হেফাজত করবেন। আল্লাহকে হেফাজত করো। তাহলে তাকে সম্মুখে পাবে। সুখের কালে তুমি আল্লাহর সাথে সদাচার করো। তিনি দুঃখের কালে তোমার সাথে সদাচারকরবেন।[৩]

এর মানে হলো, আল্লাহ ও তার বান্দার মধ্যে এর মাধ্যমে একধরনের আন্তরিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে। ফলে সে আল্লাহকে সব সময় পাশে পায়। নিঃসঙ্গতার সময় কাছে অনুভব করে। তাকে স্মরণ করার এবং তার কাছে চাওয়ার ও তার খেদমত করার স্বাদ লাভ করে। এসব কেবল সেই ব্যক্তির ভাগ্যেই জোটে, যে প্রকাশ্যে-অপ্রকাশ্যে আল্লাহর আনুগত্য করে। যেমন উহাইব ইবনে ওয়ারদ ﵀ কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, 'গুনাহগার ব্যক্তি কি ইবাদাতের স্বাদ পায়?'

তিনি বললেন, 'না, এমনকি যে ব্যক্তি গুনাহের ইচ্ছা করে সে-ও পায় না।[৪]

যখন বান্দা ইবাদাতের মজা পায় তখন সে মূলত তার রবকে চিনতে পারে। এবং তার ও তার রবের মাঝে বিশেষ এক সম্পর্ক গড়ে ওঠে। ফলে সে কিছু চাইলে তিনি তা দান করেন। তাকে ডাকলে তিনি ডাকে সাড়া দেন। যেমন সাওয়ানা ﵀ ফুজাইল ইবনে আয়ায ﵀ কে বললেন, 'আপনার ও

[১] *সহীহুল বুখারী*, হাদীস নং: ৬৫০২
[২] *মুসনাদে আহমাদ*, হাদীস নং: ২৬১৯৩
[৩] *মুসনাদে আহমাদ*, হাদীস নং: ২৭৬৩
[৪] আবু নুয়াইম, *হিলইয়াতুল আওলিয়া*: ৮/১৪৪

আপনার রবের মাঝে কি এমন সম্পর্ক আছে, তাকে ডাকার সাথে সাথে তিনি সাড়া দেন?'

তিনি তখন অজ্ঞান হয়ে পড়েন।

বান্দা দুনিয়া ও কবরের জীবনে নানা রকম বিপদাপদ ও মুসিবতে পতিত হয়। যদি তার ও তার রবের মাঝে বিশেষ সম্পর্ক থাকে, তাহলে সেটাই তার জন্য যথেষ্ট হয়। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস ﷺ কে করা রাসূল ﷺ-এর অসিয়্যাতে সেদিকেই ইশারা করা হয়েছে। যেখানে তিনি বলেছিলেন, "সুখের কালে তুমি আল্লাহর সাথে সদাচার করো। তিনি দুঃখের কালে তোমার সাথে সদাচার করবেন।"

মারুফ কারখী ﷺ কে জিজ্ঞাসা করা হলো, 'মৃত্যু, কবর, হাশর, জান্নাত ও জাহান্নাম এগুলোর মধ্যে কোন জিনিস আপনাকে নির্জনতা অবলম্বনে বেশি উৎসাহিত করে?'

তিনি বললেন, 'এসব কিছুর কর্তৃত্ব আল্লাহর হাতে। যদি তাঁর ও তোমার মাঝে পরিচয় থাকে তবে সেটাই এসবের জন্য যথেষ্ট হবে।'

সুতরাং উপকারী ইলম হলো যা বান্দা ও তার রবের মাঝে পরিচয় গড়ে তোলে। তাকে সেদিকে পথ দেখায়। এমনকি এক সময় সে নিজেই তাকে চিনে নিতে পারে। তার ঘনিষ্ঠ হয়ে পড়ে। তাকে এমনভাবে লজ্জা পেতে থাকে যেন তিনি তাকে দেখছেন। এ কারণেই সাহাবীদের অনেকেই বলেছেন, 'মানুষ থেকে সর্বপ্রথম যে ইলম তুলে নেওয়া হবে তা হলো বিনয় ও নম্রতা।'

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ ﷺ বলেছেন,

> কিছু মানুষ কুরআন তেলাওয়াত করবে কিন্তু তা তাদের কণ্ঠনালি অতিক্রম করবে না। তবে যদি সেটা অন্তরে গিয়ে মজবুতভাবে গেঁথে যায় তবে উপকার করবে।

হাসান বসরী ﷺ বলেছেন,

> ইলম দুই প্রকার। এক. মৌখিক ইলম। এটি আল্লাহর দরবারে আদমসন্তানদের বিরুদ্ধে অবস্থান করবে। দুই. অন্তরের ইলম। এটিই হলো উপকারী ইলম।[১]

সালাফে সালেহীনরা বলতেন,

[১] *সুনানে দারেমী: ১/১০২*

> আলেম তিন ধরনের। এক. আল্লাহ ও তার বিধানাবলি উভয় সম্পর্কে জ্ঞান রাখে। দুই. শুধু আল্লাহর সম্পর্কে জ্ঞান রাখে। তার বিধানাবলি বিষয়ে জ্ঞান রাখে না। তিন. শুধু আল্লাহর বিধানাবলি সম্পর্কে জ্ঞান রাখে। তার বিষয়ে জ্ঞান রাখে না।[১]

এদের মধ্যে পূর্ণাঙ্গ হচ্ছে প্রথম জন। যে আল্লাহকে ভয় করে এবং তার হুকুম-আহকাম সম্পর্কেও অবগত। মোটকথা, বান্দা ইলমের সহায়তায় তার রবকে খোঁজে এবং তার সাথে পরিচিত হয়। যখন আল্লাহর সাথে তার পরিচয় ঘটে তখন সে তাকে তার নিকটে দেখতে পায়। যখন সে তাকে নিকটে দেখতে পায় তখন তিনিও তাকে কাছে টেনে নেন এবং তার প্রার্থনায় সাড়া দেন। যেমন ইসরাইলী বর্ণনায় এসেছে,

> হে আদমসন্তান, আমাকে খোঁজ করো তবেই আমাকে পাবে। যখন তুমি আমাকে পাবে তখন সবকিছুই পাবে। আর যদি আমাকে হারাও তবে সবকিছুই হারাবে। আমি তোমার কাছে সবকিছু থেকে বেশি প্রিয়।[২]

জুন্নুন মিসরী ﵀ রাতের বেলা এই কবিতাগুলো বার বার আবৃত্তি করতেন,

أُطلُبوا لِأَنفُسِكُم ... مِثلَ ما وَجَدتُ أَنا

قَد وَجَدتُ لِي سَكَناً ... لَيسَ في هَواهُ عَنا

إِن بَعُدتُ قَرَّبَني ... أَو قَرُبتُ مِنهُ دَنا

নিজের জন্য তালাশ করো যা পেয়েছি আমি

নিরুপদ্রব শান্ত শীতল দারুণ একটি বাড়ি।

দূরে গেলে কাছে টানে কাছে যদি আসি

আরও বেশি নৈকট্যের গভীর জলে ভাসি।

ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল ﵀ মারুফ কারখী ﵀ এর ব্যাপারে বলতেন, 'তাঁর কাছে প্রকৃত ইলম তথা আল্লাহর ভয় রয়েছে।'

বোঝা গেল, প্রকৃত ইলম হচ্ছে আল্লাহর সম্পর্কে এমনভাবে অবগত হওয়া যা আবশ্যিকভাবে তাকে ভয় করতে, তাকে ভালোবাসতে, তার কাছাকাছি হতে এবং তার প্রতি আগ্রহী হতে সহায়তা করে। এরপর আল্লাহর

---

[১] *দারেমী*: ১/১০২; *শুয়াবুল ইমান*, বাইহাকী: ১/৩২৬

[২] কথাগুলোর কোনো সূত্র খুঁজে পাওয়া যায়নি।

হুকুম-আহকাম ও বান্দার যেসব কথা-কাজ ও অবস্থা-বিশ্বাস তাকে সন্তুষ্ট করে সেসব বিষয়ে অবগত হওয়া। যার মাঝে এই দুইটি বিষয়ের বাস্তবায়ন ঘটবে তার ইলমই হবে উপকারী ইলম। এমন ব্যক্তি উপকারী ইলম লাভের পাশাপাশি বিনম্র অন্তর, পরিতুষ্ট মন এবং কবুলযোগ্য দুআও অর্জন করবে।

অনুপকারী ইলমের বিপদ

উপকারী ইলম থেকে যে বঞ্চিত হবে সে এমন চারটি আপদে পতিত হবে, যার থেকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি আলাইহি ওয়াসাল্লাম আশ্রয় প্রার্থনা করেছেন।[১] তখন তার ইলমই তার বিপদের কারণ হবে। তার বিরুদ্ধে সাক্ষী হবে। ফলে তা তার কোনো উপকারে আসবে না। কারণ, তার অন্তরে স্বীয় রবের প্রতি কোনো ভয় নেই। তার মন দুনিয়ার প্রতি তুষ্ট নয়; বরং সে লোভের বশবর্তী হয়ে আরও বেশি জিনিস কামনা করে। স্বীয় রবের আদেশ পালন না করার এবং তার অপছন্দের জিনিস থেকে দূরে না থাকার কারণে তার প্রার্থনাও কবুল করা হয় না।

এসব হলো সেই ইলমের আলোচনা যার থেকে উপকার লাভ করা সম্ভব। তা হলো কুরআন-সুন্নাহ থেকে অর্জিত ইলম। আর যদি ইলম হয় অন্য কিছু থেকে অর্জিত, তবে তো সেটি সত্তাগতভাবেই অনুপকারী। এর থেকে উপকৃত হওয়া সম্ভব নয়। উপকারের চেয়ে বরং এর ক্ষতির দিকটাই প্রবল।

অনুপকারী ইলমের আলামত

অনুপকারী ইলমের আলামত হলো, যে এটি অর্জন করবে তার উদ্দেশ্য হবে দম্ভ-গর্ব, অহংকার-অহমিকা ও দুনিয়ার মান-মর্যাদা তলব করা। দুনিয়াবী বিষয়ে প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হওয়া, উলামায়ে কেরামের সাথে বিবাদে জড়ানো, অজ্ঞ ও মূর্খ লোকদের সাথে বিতর্ক করা এবং মানুষের মনোযোগ নিজের দিকে আকৃষ্ট করা। রাসূল ﷺ থেকে বর্ণিত হয়েছে,

مَنْ طَلَبَ الْعِلْمَ لِذٰلِكَ فَالنَّار فالنّار

[১] সাহাবী যায়েদ ইবনে আরকাম ؓ থেকে বর্ণিত আছে, রাসূল ﷺ বলতেন,
اللهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ، وَمِنْ قَلْبٍ لَا يَخْشَعُ، وَمِنْ نَفْسٍ لَا تَشْبَعُ، وَمِنْ دَعْوَةٍ لَا يُسْتَجَابُ لَهَا "হে আল্লাহ, আমি আপনার কাছে অনুপকারী ইলম, অবিনীত অন্তর, অপরিতৃপ্ত আত্মা এবং অগ্রহণযোগ্য দোআ থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।" *সহীহ মুসলিম*, হাদীস নং: ২৭২২

> যে ব্যক্তি এসব উদ্দেশ্যে ইলম অর্জন করবে তার জন্য জাহান্নাম, জাহান্নাম।[১]

এই ধরনের ইলমের বাহকেরা অনেক সময় আল্লাহর মারেফত লাভ ও তাকে তলব করার এবং অন্য সবকিছু থেকে বিমুখ হবার কথা বলে থাকেন। এর দ্বারা তাদের উদ্দেশ্য থাকে রাজা-বাদশাসহ অন্যান্য মানুষদের মনে জায়গা করে নেওয়া। তাদের অন্তরে নিজেদের ব্যাপারে সুধারণা সৃষ্টি করা। ভক্তবৃন্দের সংখ্যা বৃদ্ধি করা এবং এর মাধ্যমে মানুষদের ওপর নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত করা। এসব বোঝার মাধ্যম হলো, ইহুদি-খ্রিষ্টান আলেমদের মতো ওলি হওয়ার প্রকাশ্য দাবি করা। যেমন কারামিতা-বাতেনী দলের লোকেরা এমন দাবি করেছিল। সালাফে সালেহীনের পথ ছিল এরচেয়ে সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম। তারা প্রকাশ্যে-অপ্রকাশ্যে সর্বাবস্থায় নিজেদের ছোট ও তুচ্ছ মনে করতেন।

আমর ﷺ বলেছেন,

> যে নিজেকে আলেম বলবে সে আসলে জাহেল। আর যে নিজেকে মুমিন বলবে সে মূলত কাফের। আর যে বলবে সে জান্নাতে থাকবে সে আসলে জাহান্নামে যাবে।[২]

অনুপকারী ইলমের আরেকটি আলামত হলো, সত্যকে গ্রহণ না করা। তার প্রতি নিজেকে সঁপে না দেওয়া এবং যিনি সত্য বলছেন তার সামনে অহংকারপূর্ণ আচরণ করা। বিশেষ করে যদি তিনি হন মানুষের চোখে তার চেয়ে নিম্নমানের। এমনিভাবে মিথ্যাকে আঁকড়ে রাখা এই ভয়ে যে, সত্যকে মেনে নিলে মানুষের মনোযোগ তার থেকে সরে যাবে।

অনেক সময় এমন ব্যক্তি মানুষজনের সামনে মুখে মুখে নিজের বদনাম গায়। নিজেকে তুচ্ছ হিসাবে প্রকাশ করে। যাতে করে তার ব্যাপারে মানুষ ভাবে যে, সে তো নিজেকে অনেক ছোট মনে করে। এভাবে কৌশলে অন্যদের থেকে প্রশংসা আদায় করা হয়ে যাবে। এটা হলো এক প্রকারের সূক্ষ্ম লৌকিকতা। এই বিষয়ে তাবেয়ীনে কেরাম এবং তাদের পরবর্তী উলামায়ে কেরাম সতর্ক করে গিয়েছেন।

লৌকিক বিনয়-প্রদর্শনকারী ব্যক্তির থেকে প্রশংসা বাক্য সাদরে গ্রহণ করা ও এর প্রতি আকর্ষণ অনুভব করার বিষয়টিও পাওয়া যায়। যা

---

[১] *সুনানে ইবনে মাজাহ*, হাদীস নং: ২৫৪; *সহীহ ইবনে হিব্বান*, হাদীস নং: ২৯০

[২] নিঃসন্দেহে এটি অদৃশ্যের বিষয়। যার সম্পর্কে কেবল আল্লাহ তাআলাই অবগত আছেন।

পরিপূর্ণরূপে ইখলাস ও সততার পরিপন্থী। কারণ, সত্যবাদী ব্যক্তি নিজের ব্যাপারে কপটতার আশঙ্কা করে। মন্দ-মৃত্যুর ভয়ে দিনাতিপাত করে। ফলে সে নিজের প্রশংসা ও সুনাম-সুখ্যাতি থেকে সব সময় দূরে থাকার চেষ্টা করে।

উপকারী ইলমের আলামত

এই কারণেই উপকারী ইলমের বাহক যারা তাদের আলামত হলো, তারা নিজেদের জন্য আলাদা কোনো সম্মান-প্রতিপত্তি কামনা করে না। অন্তরের অন্তস্তল থেকে প্রশংসা ও সুনামকে ঘৃণা করে। কারও ওপর অহংকারী ভাব প্রকাশ করে না। হাসান বসরী ﷺ বলেছেন,

> ফকীহ ওই ব্যক্তি, যে দুনিয়ার প্রতি নিরাসক্ত, আখেরাতের প্রতি আসক্ত, দ্বীনের ব্যাপারে দূরদৃসিম্পন্ন ও স্বীয় রবের ইবাদাতের ব্যাপারে যত্নবান।[১]

তার থেকে বর্ণিত অন্য বর্ণনায় আছে,

> ফকীহ ওই ব্যক্তি, যে তারচেয়ে উন্নত ব্যক্তিকে হিংসা করে না, তারচেয়ে অনুন্নত ব্যক্তিকে বিদ্রুপ করে না, আল্লাহ তাকে যে ইলম দান করেছেন তার বিনিময় গ্রহণ করে না।

এই শেষ কথার অনুরূপ অর্থ আবদুল্লাহ ইবনে উমর ﷺ থেকেও বর্ণিত হয়েছে।

কোনো কোনো সালাফ বলেছেন, ‘আলেমের উচিত আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের লক্ষ্যে বিনয়ী হবার জন্য মাথায় মাটি রাখা।’[২] এর কারণ হলো, রবের ব্যাপারে যে যত বেশি জানবে ও তার সাথে যত বেশি পরিচিত হবে ততই ভয় ও ভালোবাসা বৃদ্ধি পাবে। তার প্রতি আনুগত্য ও বিনয় আরও বেশি পরিমাণে হবে।

উপকারী ইলমের আরেকটা আলামত হলো, এই ইলম তার বাহককে দুনিয়া থেকে পলায়ন করতে শেখাবে। যার সবচেয়ে উচ্চস্তর হলো, নেতৃত্ব এবং সুনাম-সুখ্যাতি। এগুলো থেকে দূরে থাকা এবং এসব জিনিস এড়িয়ে চলার চেষ্টা করা হলো উপকারী ইলমের আলামত। যদি কখনো অনিচ্ছায় দুনিয়াবী এসব বিষয়ে জড়িয়ে যায়, তাহলে এর বাহক শাস্তির ভয়ে ভীত হয়ে পড়ে। তার এমন অবস্থা হয়, তিনি এটাকে একটা ফাঁদ ও ছাড় বলে

[১] *কিতাবুয যুহদ*, ইমাম আহমাদ, পৃষ্ঠা: ২৬৭
[২] *আল-ফকীহ ওয়াল মুতাফাক্কিহ*, খতীব বাগদাদী: ২/১১৩

মনে করেন। যেমন ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল ﷺ তার সুনাম-সুখ্যাতি দূর-দূরান্তে পৌঁছে যাবার ফলে নিজের ব্যাপারে এমন ভয় করতেন।

উপকারী ইলমের বাহক কখনো ইলমের দাবি করেন না এবং এ নিয়ে কারও সাথে গর্বও করেন না। অন্য কাউকে মূর্খ সাব্যস্ত করেন না। তবে হ্যাঁ, যে ব্যক্তি সুন্নাহ ও আহলে সুন্নাহর বিরুদ্ধাচারণ করে তার কথা ভিন্ন। এই ক্ষেত্রে তিনি আল্লাহর জন্য রাগত স্বরে কথা বলেন। কারও ওপর নিজের বড়াই জাহের করার জন্য নয়।

উপকারী ও অনুপকারী ইলমের পার্থক্য

যে ব্যক্তির ইলম অনুপকারী, মানুষের ওপর অহংকার করা ছাড়া তার আর কোনো কাজ নেই। সে তাদের ওপর নিজের ইলমের বড়ত্ব জাহির করে এবং তাদের মূর্খ সাব্যস্ত করতে চেষ্টা করে। নিজেকে বড় করে প্রকাশ করার জন্য তাদের খাটো করে। এটি খুবই নোংরা ও নিম্নমানের স্বভাব। এমন লোক অনেক সময় তার পূর্বেকার উলামায়ে কেরামকে মূর্খ, অসচেতন ও ভুলেভরা সাব্যস্ত করতে চায়। ফলে আবশ্যিকভাবেই নিজেকে সে বেশি গুরুত্ব দেয়। নিজের গুরুত্ব মানুষের সামনে তুলে ধরার চেষ্টা করে। নিজেকে ভালো আর পূর্ববর্তী মানুষদের খারাপ ভাবে।

কিন্তু উপকারী ইলমের বাহক উলামায়ে কেরাম ঠিক এর বিপরীত হয়ে থাকেন। তারা নিজেদের মন্দ আর পূর্ববর্তী উলামায়ে কেরামকে ভালো মনে করেন। আন্তরিকভাবেই তাদের মর্যাদার কথা স্বীকার করেন। নিজেদের অক্ষমতা এবং তাদের স্তরে পৌঁছা বা এর কাছাকাছি যাওয়ার অসম্ভবতাকে অকুণ্ঠচিত্তে মেনে নেন।

ইমাম আবু হানীফা ﷺ কত সুন্দর উত্তর দিয়েছেন যখন তাকে আলকামা আর আসওয়াদ রাহিমাহুমাল্লাহ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলো যে, তাদের দুজনের মধ্যে কে বেশি মর্যাদাবান? তিনি জবাবে বলেছিলেন, 'আমরা তো তাদের নাম উচ্চারণেরও যোগ্য নই। মান-নির্ণয় তো অনেক দূরের বিষয়।'

ইবনুল মুবারক ﷺ সালাফদের আলোচনা করার সময় এই কবিতাটি আবৃত্তি করতেন,

সালাফদের কথা যখন বলো তখন
আমাদের কথা বলা থেকে বিরত থাকো;
কারণ, সুস্থ চলন্ত মানুষ কখনো

বসে থাকা ব্যক্তির মতো নয়।

অনুপকারী ইলমধারীর ভুল ধারণা

যাদের ইলম অনুপকারী তারা যখন পূর্ববর্তী কারও ওপর নিজের কথার ও বাক্‌চাতুর্যের কোনো শ্রেষ্ঠত্ব দেখতে পায়, তখন সে এটাকে আল্লাহর দরবারে নিজের ইলমের মর্যাদা ভেবে বসে থাকে। কারণ, সে তার পূর্ববর্তীদের চেয়ে ভিন্ন ধরনের জিনিস লাভ করেছে। তখন সে পূর্ববর্তীদের তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করে। স্বল্পজ্ঞানের কারণে নিজেকে মহাজ্ঞানী ভাবে। কিন্তু এই বেচারা জানে না যে, সালাফদের কম কথা বলাটা আল্লাহর প্রতি তাদের ভয় ও তাকওয়ার কারণে ছিল। যদি তারা বেশি কথা বলতে চাইতেন তবে তা অনায়াসে পারতেন। যেমন আব্দুলাহ ইবনে আব্বাস ﷺ একবার কিছু লোককে দ্বীনী বিষয়ে তর্ক করতে শুনে বললেন,

> তোমরা কি জানো না যে, আল্লাহর ভয় তাঁর কিছু বান্দাকে চুপ করিয়ে রেখেছে। তারা বোবাও নয়, বধিরও নয়। তারাই হলেন প্রকৃত ইলমের অধিকারী বাগ্মী ও মহান মনীষী। তবে আল্লাহর বড়ত্বের কথা ভেবে তাদের হৃদয়-মন ভীত ও তাদের জিহ্বা নিশ্চল।

ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল ﷺ ও ইমাম তিরমিজী ﷺ সাহাবী আবু উমামা ﷺ থেকে রাসূল ﷺ-এর একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন,

الْحَيَاءُ وَالْعِيُّ شُعْبَتَانِ مِنَ الْإِيمَانِ، وَالْبَذَاءُ
وَالْبَيَانُ شُعْبَتَانِ مِنَ النِّفَاقِ

> লজ্জা ও চুপ থাকা ঈমানের দুটি অংশ। আর অশ্লীলতা ও বেশি কথা বলা মুনাফিকির দুটি অংশ।[১]

ইমাম তিরমিজী ﷺ এই হাদীসটিকে হাসান বলেছেন। ইমাম হাকেম ﷺ ও হাদীসটি উল্লেখ করেছেন এবং তাকে সহীহ বলেছেন। ইবনে হিব্বান ﷺ তার হাদীসগ্রন্থ সহীহ ইবনে হিব্বানে সাহাবী আবু হুরাইরা ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূল ﷺ ইরশাদ করেছেন,

الْبَيَانُ مِنَ اللهِ وَالْعِيُّ مِنَ الشَّيْطَانِ، وَلَيْسَ الْبَيَانُ
كَثْرَةَ الْكَلَامِ، وَلَكِنَّ الْبَيَانَ الْفَصْلُ فِي الْحَقِّ،

[১] *মুসনাদে ইমাম আহমাদ*, হাদীস নং: ২২৩১২; *সুনানে তিরমিজী*, হাদীস নং: ২০২৭

وَلَيْسَ الْعِيُّ قِلَّةَ الْكَلَامِ، وَلَكِنْ مَنْ سفه الحق

> বলতে পারা আল্লাহর পক্ষ থেকে। আর চুপ করে থাকা শয়তানের পক্ষ থেকে। বেশি কথা বলাকে 'বলতে পারা' হিসাবে গণ্য করা হয় না। বরং বলতে পারার মানে হলো সত্য কথায় স্পষ্টবাদিতা অবলম্বন করা। এমনিভাবে কম কথা বলার মানে চুপ থাকা নয়; বরং এর মানে হলো সত্যকেআড়ালকরা।[১]

মারাসীলে মুহাম্মাদ ইবনে কাব আল-কুরজিতে আছে, রাসূল ﷺ বলেছেন,

ثلاث ينقص بهن العبد في الدنيا و يدرك بهن في الاخرة
ما هو أعظم من ذلك: الرحم و الحياء و عي اللسان

> তিনটি বস্তু এমন রয়েছে, যার কারণে দুনিয়াতে বান্দার ক্ষতি হলেও এর বিনিময়ে আখেরাতে সে এরচেয়ে বড় জিনিস লাভ করবে। সেগুলো হলো: আত্মীয়তার সম্পর্ক, লজ্জা এবং জিহ্বাকে সংযত রাখা।

আওন ইবনে আবদুল্লাহ রহ. বলেন,

> তিনটি জিনিস ঈমানের অন্তর্ভুক্ত। লজ্জা, সচ্চরিত্র এবং জিহ্বাকে সংযত রাখা। এগুলো আখেরাতে বান্দার মর্যাদা বৃদ্ধি করলেও দুনিয়াতে হ্রাস ঘটায়। আর আখেরাতে বৃদ্ধিকারী বস্তু দুনিয়াতে হ্রাস ঘটানো বস্তুর চেয়ে উত্তম।[২]

দুর্বল সূত্রে এটি মারফু হাদীস হিসাবেও বর্ণিত হয়েছে।

কোনো কোনো সালাফ বলেছেন,

> যদি কোনো ব্যক্তি কিছু মানুষের অভিমুখী হয়ে বসে এবং তারা তার মাঝে নীরবতা পরিলক্ষণ করে, অথচ তিনি বোবা নন, তাহলে বুঝতে হবে সে ব্যক্তি একজন মুসলিম ফকীহ।

যে ব্যক্তি সালাফদের মর্যাদা অনুধাবন করতে পেরেছে তার পক্ষে বোঝা সম্ভব যে, তাদের চুপ থাকাটা অতিরিক্ত কথা ও তর্ক-বিতর্ককে পরিহার করার জন্য ছিল। সুতরাং যারা তাদের পথে চলবে, তারা সঠিক পথ প্রাপ্ত হবে। আর যারা অন্যদের পথে চলবে এবং বেশি বেশি প্রশ্ন করা ও তর্ক-বিতর্ক করার

[১] *সহীহ ইবনে হিব্বান*, হাদীস নং: ২০১০

[২] *আল-মুসান্নাফ*, আব্দুর রাজ্জাক: ১১/১৪২,১৪৩

মধ্যে জড়াবে, তবে সালাফদের মর্যাদার স্বীকৃতি দেবে এবং নিজেদের ক্রটির কথা মেনে নেবে তাদের অবস্থাও ওদের কাছাকাছি হবে।

ইয়াস ইবনে মুয়াবিয়া ﷺ বলেন, 'যে ব্যক্তি নিজের দোষের স্বীকারোক্তি দেয় না সে হলো নির্বোধ।'

তাকে জিজ্ঞাসা করা হলো, 'আপনার কী দোষ আছে?'

উত্তরে তিনি বললেন, 'বেশি কথা বলা।'[১]

আর যদি সে ব্যক্তি নিজের ক্ষেত্রে মর্যাদার আর তার পূর্ববর্তীদের ক্ষেত্রে ক্রটি ও অজ্ঞতার দাবি করে, তবে সে সুস্পষ্ট পথভ্রষ্ট এবং বিরাট বড় ক্ষতিগ্রস্ত।

[১] *হিলয়াতুল আউলিয়া*, আবু নুয়াইমঃ ৩/১২৪

আলেমদের কর্তব্য

মোটকথা, বর্তমানের এই নষ্ট যুগে একজন মানুষ হয়তো আল্লাহর কাছে আলেম হিসাবে পরিচিত হওয়াকে নিজের জন্য সন্তুষ্টিজনক মনে করবে। অথ বা সে তার যুগের মানুষদের সামনে নিজেকে আলেম হিসাবে পরিচিত করাতে উদ্‌গ্রীব হবে। যদি সে প্রথম অবস্থার ওপর সন্তুষ্ট হয়, তাহলে তার ব্যাপারে আল্লাহর অবগতিই তার জন্য যথেষ্ট হওয়া উচিত। কারণ, যার সাথে আল্লাহর পরিচয় থাকে সেটাই তার জন্য যথেষ্ট হয়। আর যে মানুষের সামনে নিজেকে আলেম হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করতে উদ্‌গ্রীব হয়ে থাকে সে রাসূল ﷺ-এর এই হাদীসের অন্তর্ভুক্ত হবে,

مَنْ طَلَبَ الْعِلْمَ لِيُبَاهِيَ بِهِ الْعُلَمَاءَ، أَوْ لِيُمَارِيَ بِهِ السُّفَهَاءَ أَوْيَصْرِفَ بِه وُجُوْهَ النَّاسِ إِلَيْه فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَه مِنَ النَّارِ

> যে ব্যক্তি ইলম অর্জন করে এর মাধ্যমে আলেমদের সাথে প্রতিযোগিতা করার বা মূর্খদের সাথে তর্ক করার উদ্দেশ্যে অথবা এর সহায়তায় নিজের দিকে মানুষের দৃ আকর্ষণ করাতে, সে যেন তার স্থান জাহান্নামে বানিয়েনিল।[১]

উহাইব ইবনে ওয়ারদ ﷺ বলেন, 'এমন অনেক আলেম আছে যাদের মানুষ আলেম বলে ডাকলেও আল্লাহর দরবারে সে জাহেলদের দলভুক্ত।'[২]

সহীহ মুসলিমে আবু হুরাইরা ﷺ থেকে বর্ণিত হয়েছে, রাসূল ﷺ ইরশাদ করেছেন,

إِنَّ أَوَّلَ مَنْ تسعّر به النارثلاثة، أَحَدُهُمْ مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ وَ تَعَلَّمَ الْعِلْمَ لِيُقَالَ هوَ قَارِئٌ وَ هُوَ عَالِمٌ، وَ يُقَالُ لَه: قد قِيْلَ ذٰلِكَ، ثُمَّ أمرَبِه فَيُسْحَبُ علي وَجْهِه حتّي أُلْقِيَ فِي النَّارِ...

---

[১] *সুনানে তিরমিজী*, হাদীস নং: ২৬৫৪

[২] *হিলয়াতুল আউলিয়া*, আবু নুয়াইম: ৮/১৫৭

> যাদের মাধ্যমে সর্বপ্রথম জাহান্নামকে প্রজ্বলিত করা হবে, তারা তিন শ্রেণির লোক। এক. যে কুরআন পড়েছে এবং ইলম অর্জন করেছে এই উদ্দেশ্যে যে, তাকে কারী বা আলেম বলা হবে। তাকে ডেকে বলা হবে, তোমাকে তা বলা হয়েছে। অতঃপর তার ব্যাপারে আদেশ দেওয়া হবে, তখন তাকে উল্টোমুখী করে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে...।[১]

কিতাবের প্রতি ঈমান আনার এবং গরুর গোশতের সংস্পর্শে নিহত ব্যক্তির জীবিত হওয়ার মতো নিদর্শনসমূহ প্রত্যক্ষ করার পরেও অন্তরের কাঠিন্যের দরুন আল্লাহ তাআলা আহলে কিতাবদের যে

নিন্দা করেছেন, সে বিষয়ে আমাদের চিন্তা-ভাবনা করা উচিত। আমাদের তাদের মতো হতে নিষেধ করা হয়েছে। বলা হয়েছে,

أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ

> যারা মুমিন তাদের জন্য কি আল্লাহর স্মরণে এবং যে সত্য অবতীর্ণ হয়েছে তার কারণে হৃদয় বিগলিত হওয়ার সময় আসেনি? তারা তাদের মতো যেন না হয়, যাদের পূর্বে কিতাব দেওয়া হয়েছিল। তাদের ওপর সুদীর্ঘকাল অতিক্রান্ত হয়েছে অতঃপর তাদের অন্তঃকরণ কঠিন হয়ে গেছে। তাদের অধিকাংশই পাপাচারী।[২]

অন্য জায়গায় তাদের অন্তর কঠিন হওয়ার কারণ উল্লেখ করা হয়েছে এভাবে,

فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً

> অতএব তাদের অঙ্গীকার ভঙ্গের দরুন আমি তাদের ওপর অভিসম্পাত করেছি এবং তাদের অন্তরকে কঠিন করে দিয়েছি।[৩]

আল্লাহ তাআলা সংবাদ দিলেন যে, তাদের অন্তর কঠিন হয়ে যাওয়া ছিল আল্লাহর সাথে তাদের কৃত অঙ্গীকারভঙ্গের শাস্তি। তা হলো, তার আদেশ

---

[১] *মুসনাদে আহমাদ*, হাদীস নং: ৮২৭৭

[২] সূরা হাদীদ, (৫৭): ১৬

[৩] সূরা মায়েদা, (০৫): ১৩

লঙ্ঘন করা এবং নিষিদ্ধ কাজে লিপ্ত হওয়া। অথচ তাদের কাছ থেকে অঙ্গীকার নেওয়া হয়েছিল, তারা তা করবে না। অতঃপর আল্লাহ তাআলা বলেন,

يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ وَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ

> তারা কালামকে তার স্থান থেকে বিচ্যুত করে দেয় এবং তাদের যে উপদেশ দেওয়া হয়েছিল তারা তা থেকে উপকার লাভ করার বিষয়টি বিস্মৃত হয়েছে।[১]

উল্লেখ করা হলো, তাদের অন্তর কঠিন হওয়া দুইটি জিনিসকে তাদের জন্য অত্যাবশ্যক করেছে। এক. কালামকে তার স্থান থেকে সরিয়ে ফেলা। দুই. তাদের যে উপদেশ দেওয়া হয়েছিল তা বিস্মৃত হওয়া। অর্থাৎ তাদের যে প্রজ্ঞা ও সুন্দর নসীহত প্রদান করা হয়েছিল তার প্রতি ভ্রুক্ষেপ না করার ফলে সেটা তারা ভুলে গিয়েছে এবং তার ওপর আমল করা থেকে বঞ্চিত হয়েছে।

আহলে কিতাবদের সাথে সাদৃশ্য অবলম্বন করার কারণে এই দুইটি বিষয় এই উম্মতের সেসব আলেমদের মধ্যেও পাওয়া যায়, যারা পথভ্রষ্ট হয়েছে। প্রথমটি হলো, কালামকে বিকৃত করা। কারণ, যে আমল ছাড়াই ফিকহের জ্ঞান হাসিল করে তার অন্তর কঠিন হয়ে যায়। ফলে সে পরবর্তী সময় আর আমলের প্রতি তেমন মনোযোগী হতে পারে না। বরং সে কালামকে বিকৃত করা এবং কুরআন-সুন্নাহর শব্দাবলিকে তার আপন স্থান থেকে সরিয়ে ফেলা ও সূক্ষ্ম কৌশলের মাধ্যমে একে দূরবর্তী রূপকার্থে প্রয়োগ করার প্রতি ব্যস্ত হয়ে পড়ে।

যেখানে আল্লাহর কালামের শব্দকে আঘাত করতে সক্ষম হয় না সেখানে সুন্নাহের শব্দকে আঘাত করে থাকে। যারা সরাসরি নস বা মূল বক্তব্যকে আঁকড়ে ধরে এবং এর থেকে যে অর্থ বুঝে আসে তাকে সেই অর্থেই প্রয়োগ করে, তাদের নিন্দা করে। তাদের অজ্ঞ এবং 'হাশাবী'[২] বলে আখ্যায়িত করে। এই বিষয়টি আকীদার মূলনীতি বিষয়ক কালামবিদদের মধ্যে এবং রায়পন্থী ফুকাহায়ে কেরাম ও দর্শনপন্থী সুফীদের মধ্যে বেশি পরিলক্ষিত হয়।

রায়পন্থীরা তাদের কোনো শায়েখ থেকে নিজেদের কিতাবে উল্লেখ করেছে, প্রত্যেক ইলমের ফলাফল তার মর্যাদাকে প্রকাশ করে। সুতরাং যারা ইলমে তাফসীরের সাথে সংশ্লিষ্ট তাদের লক্ষ্য হলো, মানুষের কাছে ঘটনাবলি

[১] সূরা মায়েদা, (০৫): ১৩

[২] একটা বাতিল ফিরকার নাম।

বর্ণনা করা এবং ওয়াজ করা। আর যারা নিজেদের রায় এবং ইলম নিয়ে ব্যস্ত থাকে তারা ফতওয়া প্রদান করে, বিচারকার্য পরিচালনা করে, হাকেম হয়, দরস প্রদান করে। এ সমস্ত ব্যক্তিদের তাদের সাথে মিল রয়েছে যাদের ব্যাপারে বলা হয়েছে,

يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ

তারা পার্থিব জীবনের বাহ্যিক দিক জানে এবং তারা পরকালের খবর রাখে না।[১]

এই বিষয়ে তাদের সবচেয়ে বেশি প্ররোচিত করে দুনিয়ার প্রতি তাদের সীমাহীন ভালোবাসা ও সম্মান লাভের বাসনা। যদি তারা দুনিয়াবিরাগী হতো এবং আখেরাতের প্রতি আগ্রহী হতো, রাসূল ﷺ-এর ওপর আল্লাহ তাআলার নাজিলকৃত বিষয়কে আঁকড়ে ধরার জন্য নিজেকে ও আল্লাহর বান্দাদের নসীহত করত এবং এসব বিষয়ে মানুষকে তাগাদা দিত, তাহলে অধিকাংশ মানুষ আল্লাহ-ভীতি থেকে দূরে সরে যেত না। কুরআন-সুন্নাহতে যা আছে সরাসরি তা-ই তাদের জন্য যথেষ্ট হতো। যারা কুরআন-সুন্নাহ থেকে সরে যেত তাদের সংখ্যা হতো খুবই অল্প।

আল্লাহ তাআলা এমন ব্যক্তিদের অস্তিত্ব বহাল রাখবেন, যারা কুরআন-সুন্নাহের নুসুস থেকে বহির্গত অর্থ অনুধাবন করে সেগুলোকে যথাস্থানে স্থাপন করে। এর মাধ্যমে মানুষদের উদ্ভাবিত বাতেনী শাখাগত বিষয় এবং সে সকল অবৈধ কূটকৌশলের প্রয়োজনও নিঃশেষিত হয়ে যায়, যার মাধ্যমে সুদসহ অন্যান্য হারাম জিনিসের রাস্তাকে উন্মুক্ত করা হয় এবং আহলে কিতাবদের মতো আল্লাহর হারাম করা জিনিসকে হালাল সাব্যস্ত করার চেষ্টা করা হয়।

মুমিনরা সত্য নিয়ে যে মতবিরোধে লিপ্ত হয়েছে আল্লাহ তাআলা স্বীয় আদেশের মাধ্যমে সে বিষয়ে তাদের সঠিক পথ প্রদর্শন করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা যাকে চান সঠিক পথ প্রদর্শন করে থাকেন।

وصلي الله علي سيدنا محمد و اله و صحبه و سلم تسليما
كثيرا إلي يوم القيامة، و حسبنا الله و نعم الوكيل

[১] সূরা রুম, (৩০): ০৭

লেখকের জীবনী

আল্লাহ তাআলা প্রতি শতাব্দীতেই এমন কিছু আলেমকে দুনিয়ার বুকে পাঠান যাদের অক্লান্ত পরিশ্রম আর রক্ত-ঘামের বিনিময়ে ইসলাম নামক বটবৃক্ষ সতেজ ও সজীব থাকে। তারা নিরলস ছায়া দিয়ে যেতে থাকেন মানবসভ্যতাকে। নুয়ে পড়া মুসলিম জাতিকে তারা দান করেন নবচেতনা। সমাজের রগ-রেশায় তৈরি হওয়া কুপ্রথা আর কুসংস্কারকে তারা করেন বিদূরিত। ইলমের ময়দানকে করেন সঞ্জীবিত। হিজরী অষ্টম শতাব্দীতে আগমন করা এমনই একজন জগৎখ্যাত মনীষী আলেম হলেন ইবনে রজব হাম্বলী ﵀।

তাঁর নাম ও উপাধি

তাঁর পুরো নাম যাইনুদ্দীন আবদুর রহমান বিন আহমাদ বিন রজব বিন আলহুসাইন বিন মুহাম্মাদ বিন আবিল বারাকাত মাসউদ আসসুলামী আলবাগদাদী আদ্দিমাশকী আলহাম্বলী। তবে ইবনে রজব হাম্বলী উপাধিতেই তিনি বিশ্বব্যাপী পরিচিতি লাভ করেছেন। তাঁর রচিত বই-পুস্তকে এবং তাকে নিয়ে লেখা অন্যদের লেখাতেও তিনি এই নামেই প্রসিদ্ধি পেয়েছেন।

জন্ম ও শিক্ষাদীক্ষা

৭৩৬ হিজরী মোতাবেক ১৩৩৫ ঈসায়ী সনে তিনি ইরাকের বাগদাদ শহরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর দাদা ছিলেন একজন ধর্মতত্ত্ববিদ, ইসলামী শাস্ত্রের বিশিষ্ট বিদ্বান। বিশেষ করে হাদীসশাস্ত্রের। তার বাবাও বাগদাদে জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং বহু আলেমের কাছে শিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন।

ইবনে রজব ﵀ এর যখন পাঁচ বছর বয়স তখন তাঁর পরিবার দামেস্কে স্থানান্তরিত হয়। তখন তিনি জেরুসালেম সফর করেন এবং সেখানে আল-আলাঈ ﵀ এর কাছে জ্ঞানার্জন করেন। এরপর তিনি বাগদাদে যান এবং সেখান থেকে মক্কা গমন করেন। মক্কায় তাঁর পিতা তাঁর শিক্ষার জন্য সুব্যবস্থা করে রাখেন। এরপর তিনি মিশর সফর করেন এবং এরপর আবার দামেস্কে ফিরে যান। সেখানে তিনি ছাত্রদের শিক্ষাদান শুরু করেন। তিনি ইবনুন নাকীব (মৃত্যু: ৭৬৯ হিজরী), আস সুবকী, আল ইরাকী (৮০৬ হিজরী), মুহাম্মাদ ইবনে ইসমাঈল আল খাব্বাজ রাহিমাহুমুল্লাহ প্রমুখ বিদ্বানের কাছে শিক্ষা

গ্রহণ করেন। তিনি যুগবিখ্যাত আলেমে দ্বীন ইবনু কায়্যিমিল জাওযিয়্যাহ রহ. এর কাছে মৃত্যুর আগ পর্যন্ত অধ্যয়ন করেন।

তাঁর শিক্ষকবৃন্দ

ইবনে রজব হাম্বলী ﵀ ছিলেন ইলমপিপাসু মানুষ। যেখানেই ইলমের ঘ্রাণ পেয়েছেন ছুটে গিয়েছেন। ফলে তাঁর শিক্ষকবৃন্দের তালিকাটাও বেশ লম্বা। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকজন হলেন:

- আবুল আব্বাস আহমাদ। যিনি ইবনু কাযিল জাবাল নামে প্রসিদ্ধ। (৬৯৩-৭৭১ হি.) দামেস্কের সফরে তিনি তাঁর থেকে জ্ঞানার্জন করেন।
- আহমাদ বিন আলী বিন মুহাম্মাদ বাগদাদী (৭০৭-৭৫০ হি.)
- সফিউদ্দিন আবু আবদুল্লাহ (৭১২-৭৪৯ হি.) বাগদাদে অবস্থানকালে তিনি তাঁর কাছে হাদীস পড়েন।
- আল্লামা আলাঈ ﵀ (৬৯৪-৭৬১হি.)। ফিলিস্তিনের কুদসে তিনি তাঁর থেকে ইলম অর্জন করেন।
- ইযযুদ্দীন আবদুল আযীয বিন মুহাম্মাদ (৬৭১-৭৪০ হি.) মিশরে ও মক্কায় তাঁর সাথে সাক্ষাৎ হয়।
- সিরাজুদ্দীন আবু হাফস (৬৮৩-৭৫০ হি.)। তিনি ইরাকের প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস ছিলেন। বাগদাদ শহরে তাঁর থেকে তিনি ইলমে হাদীস অর্জন করেন।
- ইবনুল খাব্বায ﵀ (৬৭৭-৭৫৪ হি.)। দামেস্কে তিনি তাঁর হাদীস শ্রবণ করেন এবং অনেক বেশি উপকৃত হন।
- নাসিরুদ্দীন মুহাম্মাদ ইবনে ইসমাঈল (৬৭৪-৭৫৬ হি.)। তিনি ইবনুল মুলুক উপাধিতে প্রসিদ্ধ ছিলেন। মিশরে তাঁর থেকে তিনি হাদীস শ্রবণ করেন এবং অনেক বেশি উপকৃত হন।
- ইবনু কাইয়্যিমিল জাওযিইয়্যাহ (৬৯১-৭৫১ হি.)। দামেস্কে তাঁর সান্নিধ্য তিনি গ্রহণ করেন এবং এক বছরেরও বেশি সময় তাঁর সাথে থাকেন।
- ইবুল হারাম কালানিসী (৬৮৩-৭৬৫ হি.)। মিশরের কায়রোতে তিনি তাঁর থেকে ইলম অর্জন করেন।

তাঁর ছাত্রবৃন্দ

ইবনে রজব হাম্বলী ﵀ নিজে ইলম অর্জন করার পাশাপাশি ইলম বিতরণেও অগ্রগণ্য ভূমিকা পালন করেছেন। দরসপ্রদান এবং লেখালেখির মাধ্যমে তাঁর ইলমকে ছড়িয়ে দিয়েছেন চারপাশে। নিম্নে তাঁর কিছু ছাত্রের নাম উল্লেখ করা হলো।

- মুহিব্বুদ্দীন আবুল ফদল (৭৬৫-৮৪৪ হি.)। তিনি মিশরের মুফতী হিসাবে প্রসিদ্ধ ছিলেন। দামেস্কে ইবনে রজব হাম্বলী ﵀ এর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিলেন।
- যাইনুদ্দীন আবু যর (৭৫৮-৮৪৬ হি.)। তিনি আল্লামা যারকাশী নামে প্রসিদ্ধ। দামেস্কে ইবনে রজব হাম্বলী ﵀ এর কাছ থেকে হাদীস শ্রবণ করেছেন।
- মুহিব্বুদ্দীন আবুল ফদল (জন্ম: ৭৬৫ হি.)। তিনি বাগদাদে জন্মগ্রহণ করেন এবং দামেস্কে ইবনে রজব হাম্বলী ﵀ থেকে ইলম অর্জন করেন।
- কাযিল কুযাত শামসুদ্দীন মুহাম্মাদ ইবনে আহমাদ আলমাকদেসী (৭৭১-৮৫৫ হি.)। তিনি মক্কার বিচারক পদে কর্মরত ছিলেন।
- ইযযুদ্দীন মুহাম্মাদ বিন বাহাউদ্দীন আলী আলমাকদেসী (৭৬৪-৮২০ হি.)।

তাঁর রচনাবলি

ইবনে রজব হাম্বলী ﵀ জীবদ্দশায় প্রচুর গ্রন্থ রচনা করেছেন। তার অনেকগুলো আজও সমান জনপ্রিয় ও বহুলপঠিত। তাঁর রচিত কিছু বইপত্রের নাম উল্লেখ করা হলো:

- ফাতহুল বারী শরহুল বুখারী। এটি বুখারী শরীফের একটি ভাষ্যগ্রন্থ। তিনি পূর্ণাঙ্গরূপে এটি রচনা করতে পারেননি। জানাযার অধ্যায় পর্যন্ত লেখার পর তাঁর ইন্তেকাল হয়ে যায়।
- শরহু ইলালিত তিরমিজী। এটি ইমাম তিরমিজী ﵀ রচিত কিতাবুল ইলালের ব্যাখ্যাগ্রন্থ। যা অত্যন্ত প্রসিদ্ধ ও সর্বমহলে গ্রহণযোগ্য।
- জামিউল উলুমি ওয়াল হিকাম। এটি ইমাম নববী রহ. কর্তৃক রচিত প্রসিদ্ধ গ্রন্থ আলআরবাঈন এর একটি বৃহৎ ব্যাখ্যাগ্রন্থ। আজ পর্যন্ত চল্লিশ হাদীছের শ্রেষ্ঠ ব্যাখ্যাগ্রন্থ হিসাবে এটি সমাদৃত হয়ে আসছে।
- আলইস্তিখরাজ ফী আহকামিল খারাজ

- আররদ্দু আলা মানিত্তাবা গাইরাল মাযাহিবিল আরবাআহ। যারা মাযহাব মানতে চায় না তাদের বিপক্ষে লিখিত। মাযহাব বিরোধিতার খণ্ডন নামে এটি বাংলা ভাষায় সম্প্রতি অনূদিত হয়ে প্রকাশিত হয়েছে।
- লাতাইফুল মাআরিফ। এটি মূলত বারো মাসের আমল নিয়ে রচিত একটি চমৎকার গ্রন্থ। আমাদের দেশের বারো চান্দের ফজিলত এর সুন্দর বিকল্প হতে পারে এই বইটির অনুবাদ। এতে কুরআন-সুন্নাহর আলোকে বারো মাসের আমলগুলোকে উপস্থাপন করা হয়েছে।
- তাফসীরু সূরাতিল ইখলাস
- তাফসীরু সূরাতিল ফালাক
- তাফসীরু সূরাতিন নাসর
- আহওয়ালুল কুবুর।
- আততাখওয়ীফ মিনান্নার
- আলফারকু বাইনান নাসীহাতি ওয়াত্তা'বীর
- ফাদাইলুশ শাম
- সীরাতু আবদুল মালিক ইবনে আবদুল আযীয
- রিসালাহ ফী শুআবিল ঈমান
- যাম্মু কসওয়াতিল কলব
- সিফাতুন্নার ওয়া সিফাতুল জান্নাহ
- যাম্মুল খমার
- মানাফিউল ইমাম আহমাদ
- ফাইদাতু ইবনি রজব হাওলা হাদীসিন নুযুল।

এ ছাড়াও তিনি ছোট-বড় প্রচুর পুস্তিকা রচনা করেছেন। সেগুলোর মধ্য হতে ফাদলু ইলমিস সালাফ আলা ইলমিল খালাফ অত্যন্ত প্রসিদ্ধ একটি পুস্তিকা। যার অনুবাদই হলো আমাদের এই বইটি।

তাঁর ব্যাপারে মনীষীদের মন্তব্য

ইবনে কাযী শুহবাহ ইবনে রজব ﷺ এর ব্যাপারে বলেন,

> তিনি জ্ঞান-বিজ্ঞানের বহু শাখায় পারদর্শী ছিলেন। তিনি একজন অদ্বিতীয় হাম্বলী ফকীহ হিসাবে প্রতিতি হওয়ার আগ পর্যন্ত হাম্বলী ফিকহের ওপর নিবি মনে বহু সময় দেন। হাদীসশাস্ত্রের বিভিন্ন অপূর্ণতা পূরণ করার জন্য ও জ্ঞান অর্জনের জন্য নিজেকে অনুগত

করে নিয়েছিলেন। তিনি লেখালেখির জন্য নির্জনতাকে বেছে নিয়েছিলেন।

হাফিয ইবনে হাজার আল-আসকালানী রহ. তাঁর ব্যাপারে বলেন,

তিনি খুব উঁচু পর্যায়ের হাদীস শাস্ত্রবিদ ছিলেন। উসূলুল হাদীস, রিজালশাস্ত্র, হাদীসের সনদ-মতন এবং হাদীসের অর্থ ও ব্যাখ্যা সম্পর্কে পারদর্শী ছিলেন।

ইমাম আবু মুফলিহ আল-হাম্বলী ﵀ তাঁর ব্যাপারে বলেন,

তিনি ছিলেন শাইখ, অন্যতম শ্রে বিদ্বান, হাফিয এবং এমন একজন যিনি পার্থিব জীবন থেকে বিমুখ। তিনি হাম্বলী মাযহাবের একজন প্রসিদ্ধ আলেম এবং বহু গুরুত্বপূর্ণ জ্ঞানগর্ভ গ্রন্থ রচনা করেছেন।

হাফেজ আবুল ফজল তাকিউদ্দীন ইবনে ফাহাদ মক্কী ﵀ তাঁর সম্পর্কে লিখেছেন,

তিনি হাদীসের হাফেজ ও ইমাম, শ্রে ফকীহ, দুনিয়ার প্রতি নির্মোহ আলেমদের একজন, ইবাদাতগুযার ইমামদের অন্যতম, মুহাদ্দিসদের শিক্ষক এবং মুসলিমদের খতীব।

শিহাব ইবনে হাজ্জী ﵀ তাঁর সম্পর্কে বলেন,

তিনি হাদীসশাস্ত্রের অসাধারণ সমালোচক ও গবেষক ছিলেন। সমসাময়িকদের মাঝে হাদীসের সনদ এবং সনদের বিচার-বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে সর্বাধিক পারদর্শী ছিলেন। আমাদের সমসাময়িক অধিকাংশ হাম্বলী আলেম তাঁর ছাত্র ছিলেন।

মৃত্যু

ইবনে রজব রহ. ৭৯৫ হিজরি সনের চতুর্থ রমযানের পবিত্র এক রাতে (১৩৯৩ ঈসায়ী) মৃত্যুবরণ করেন। তখন তাঁর বয়স হয়েছিল ৫৯ বছর। মৃত্যুর পর দিন তাঁর জানাযার সালাত অনুষ্ঠিত হয় এবং বাবুস সাগীর কবরস্থানে তাকে সমাহিত করা হয়।

সালাফদের ইলমী শ্রেষ্ঠত্ব

আমরা এমন একটা সময়ে বাস করছি, যখন চারদিকে শুধু ফিতনা আর ফিতনা। এসব ফিতনার মধ্যে বর্তমান সময়ে যে বিষয়টা মহামারির আকার ধারণ করেছে তা হলো, পূর্বযুগের উলামায়ে কেরাম এবং সালাফে সালেহীনদের তুলনায় পরবর্তী যুগের আলেমদের বেশি গুরুত্ব দেওয়া। তাদের বেশি জ্ঞানী ও অধিক ইলমের অধিকারী মনে করা।

এই ফিতনাটা আজকের যুগের নতুন কিছু নয়। পূর্বযুগেও এর অস্তিত্ব ছিল। যদিও সেটা এখনকার মতো এতটা শক্তিশালী ও প্রবল ছিল না। তারপরেও উলামায়ে কেরাম এই বিষয়ে কলম ধরেছেন। নিজেদের রচনায় বারংবার এই বিষয়ে সতর্ক করেছেন।

সালাফে সালেহীন হলো মূলত আমাদের স্তম্ভ। সালাফদের অনুসরণ হচ্ছে সবচেয়ে নিরাপদ ও সতর্ক পথ। কারণ, তারা আমাদের চেয়ে হাজার গুণ বেশি মুত্তাকী, পরহেজগার ও দ্বীনের গভীর ইলমের অধিকারী ছিলেন। আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ ﷺ বলেছেন, 'তোমাদের মধ্য হতে কেউ যদি কারও অনুসরণ করতে চায় তবে তার জন্য কর্তব্য হলো যারা গত হয়ে গিয়েছেন তাদের অনুসরণ করা। কারণ, জীবিতরা ফিতনা থেকে নিরাপদ নয়।'

ইবনে রজব হাম্বলী ﷺ রচিত 'ফাদলু ইলমিস সালাফ আলা ইলমিল খালাফ' এই বিষয়ে লিখিত একটি স্বতন্ত্র ছোট্ট পুস্তিকা। যার মধ্যে তিনি অত্যন্ত চমৎকারভাবে দলিল-প্রমাণের আলোকে সালাফদের শ্রেষ্ঠত্ব ফুটিয়ে তুলেছেন।